বিশ্বের
রূপকথা



বিশ্বের
শ্রেষ্ঠ রূপকথা

অনুবাদক

রমেশ চন্দ্র মজুমদার

(গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ,
নাট্যকার, ও শিশু সাহিত্যিক)

ও

উজ্জ্বল কুমার

নবকল্প

কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা—
অনুরাধা দেবী

প্রথম প্রকাশ :-
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

মূল্য—১০ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ—
মিতালী দেবী
ও
উত্তম জানা

মুদ্রণ— ফুল্লরা প্রিন্টার্স

পশু আর সুন্দরী

(ইংল্যাণ্ড)

ইংল্যাণ্ডের এক গ্রামে বহুদিন আগে একজন লোক থাকতেন। তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল। তিনটি মেয়েকেই তিনি বেশ ভালবাসতেন। সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন ছোট মেয়েটিকে। সে যেমন সুন্দরী, তেমনি ছিল তার নাম বিউটি। মেয়েটি স্বভাবেও খুব ভাল।

একদিন ঐ লোকটির শহরে যাবার দরকার হয়। তিনটি মেয়েকেই ডেকে তিনি বললেন, শোন তোমরা, আমি আজ শহরে যাচ্ছি। সেখানে আমি এক সপ্তাহ থাকবো। ফিরবার সময় তোমাদের জন্য উপহার নিয়ে আসবো।

এবার বড় মেয়েটি বললে, আমার জন্য এক জোড়া জুতো আনবে। আমার সব জুতো পুরনো। এই গাঁয়ের বাজারে ভালো জুতো পাওয়া যায় না।

—বেশ, তাই আনবো।

মেজ মেয়ে এবার বললে, আমার জন্য ছোট একটা বিড়াল নিয়ে এসো বাবা। তার সঙ্গে আমি খেলা করবো।

—বেশ, তাই হবে।

ছোট মেয়ে বিউটি বললে, আমার জন্য একটা লাল ফুল নিয়ে এসো, বাবা। আমাদের বাগানে অনেক ফুল আছে, কিন্তু একটিও লাল ফুল নেই।

—বেশ মা, তোমার জন্য লাল ফুল আনবো। মেয়েদের কথা দিয়ে ভদ্রলোক শহরে চলে গেলেন। সেখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বড় মেয়ের জন্য সুন্দর একজোড়া নীল রঙের জুতো কিনলেন।

তারপর মেজো মেয়ের জন্য কিনলেন মিশকালো একটা ছোট

বিড়াল। দুজনেরটা কেনা হলো, কিন্তু বিউটির জন্য লালফুল আর কিনলেন না।

তিনি ভাবলেন, যেদিন বাড়ী যাবো আমি সেদিন তার জন্য লাল ফুল কেনা যাবে। এখন কিনে রাখলে ফুলটা যাবার দিনে শুকিয়ে যাবে। ফুলটা নষ্ট হবে।

এরপর এক সপ্তাহে তাঁর কাজ মিটে গেল। তিনি জুতো জোড়া আর কালো বিড়াল নিয়ে গাঁয়ের দিকে চললেন। তাড়াতাড়ির জন্য তাঁর লালফুল কেনা হলো না।

শহর থেকে তিনি বহুদূরে এসে তার ছোটমেয়ে বিউটির লালফুলের কথা মনে হলো। হায়! কি ভুল হয়ে গেল! লালফুল কেনা হলো না।

তাহলে কি হবে? লালফুল না নিয়ে গেলে তো বাড়ীতে যাওয়া যাবে না। কিন্তু লালফুল পাবো কোথায়? মস্ত ভুল করলাম যে!

পথ চলতে চলতে ভদ্রলোক খুব চিন্তা করতে থাকেন। কি করা যাবে এখন?

অনেক পরে তাঁর মনে হলো যে, তাঁদের গাঁয়ের কাছে একটা বিরাট বাড়ি আছে। ঐ বাড়ির চারপাশে সুন্দর সুন্দর ফুলবাগান আছে। নিশ্চয়ই সেইসব বাগানে লালফুল খোঁজ করলে পাওয়া যাবে।

একটা বিরাট অসুবিধে ছিল সেই বাগানে অনুপ্রবেশ করার। কেউ সেই বাগানে যেতে সাহস করে না। এর কারণ, ঐ বাড়িটায় একটা বড় জন্তু আছে। তাকে চারপাশের সবাই ভয় করে।

এই ভয়ঙ্কর জন্তুটা মানুষের মত চলাফেরা করে এবং কথাবার্তা বলে। এর শরীরটা প্রায় মানুষের মত হলেও মাথাটা ঠিক সিংহের মত।

এই ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে সবাই বলে বিষ্ট অর্থাৎ পশু। অদ্ভুত তার আকৃতি।

ক্রমে সেই বাড়িটার সামনে এসে ভদ্রলোক থামলেন। বারবার

চাইলেন বাগানটার দিকে। দেখতে পেলেন ঐ বাগানে অনেকগুলো লালফুল ফুটে আছে।

এবার তিনি ভাবলেন, চট করে পাঁচিল টপকে বাগানে গিয়ে একটা লালফুল নিয়ে ফিরে আসবো। ভয়ঙ্কর পশুটা দেখতেই পাবে না আমাকে!

কিন্তু ফুল তুলে ফিরতেই সেই পশুটার মুখোমুখি হলেন। কি ভয়ঙ্কর পশু!

পশুটা বললে, আপনি কে? কি করছেন এখানে? একথা জানেন না যে, কেউ আমার বাগানে আসতে পারে না? এবার আপনাকে আমার বাগানে আটকে রাখবো। পরে আপনাকে মেরে ফেলা হবে।

ভদ্রলোক ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতেই বললেন, দয়া করে আমায় মারবেন না। আমায় ছেড়ে দিন। যা চাইবেন আপনি আমি তাই দেবো। আমার মেয়েদের কাছে আমাকে যেতে দিন।

তখন পশু বললে, ঠিক আছে। বাড়ী ফিরে গিয়ে প্রথম যে প্রাণীটি দেখতে পাবেন তাকেই আমার হাতে দিতে হবে। এই কথায় রাজী থাকলে আপনাকে আটকাবো না বা মারবো না।

পরক্ষণে পশুটা বললে, যদি আপনি বাড়ি গিয়ে মত পাল্টে ফেলেন, তাহলে কালই আপনার বাড়ী গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে আসবো।

ভদ্রলোক ভাবলেন, বাড়িতে গেলে প্রথমে সেই পোষা কুকুরটা তো ছুটে আসবে। কাজের আর কোন চিন্তা নেই।

তাই তিনি সেই পশুকে বললেন, ঠিক আছে। বাড়ীতে ঢুকতেই যাকে প্রথমে সামনে পাবো তাকে আপনার হাতে তুলে দেবো।

—তবে এবার আপনি বাড়ি যেতে পারেন।

মুক্তি পেয়ে ভদ্রলোক এবার বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। যাবার সময় পথে ভাবলেন, বাড়ী গেলে আমার পোষা কুকুরটাই ছুটে আসে

প্রথমে। তাই ঐ পশুটার হাতে আমার পোষা কুকুরকেই দিতে হবে! এতদিনের কুকুরটা! একথা ভেবে তার মন খারাপ হয়ে গেল।

তিনি ক্রমে বাড়ী এলেন। তাঁর পোষা কুকুরটা ছুটে এলো না। কারণ তখন কুকুরটাকে একটা বাটিতে করে দুধ খেতে দেওয়া হয়েছিল। দুধ খাওয়ায় ব্যস্ত থাকায় প্রভুকে সে লক্ষ্য করেনি।

বিউটি অর্থাৎ ছোটমেয়ে বসেছিল ঠিক জানলার পাশে। বাবাকে দেখে সে ছুটে গেল ঘরের বাইরে এক দৌড়ে।

ভদ্রলোক তাকে দেখে চমকে উঠলেন।—এ্যাঁ! বিউটি! কুকুরটা এলো নাতো!

তাহলে বিউটিকেই পশুটার হাতে তুলে দিতে হবে! আমার প্রিয় ছোট মেয়ে, মা হারা নয়নের নিধিকে!

মেয়েকে তিনি বললেন, কেন তুমি বাইরে এলে মা? এখন আমি কি করবো? একি সমস্যার সম্মুখীন হলাম!

ভদ্রলোক কম্পিত কণ্ঠে মেয়েকে বললে, তোমাকেই দিয়ে দিতে হবে!

অতঃপর তিনি ছোটমেয়েকে সব কথা খুলে বললেন।—মা, আমি ঐ বাড়ীটার পশুর কাছে কথা দিয়ে এসেছি যে, আমি বাড়ি গিয়ে প্রথমে যাকে দেখাবো তাকে এনে দেবো পশুটাকে।

মেয়েটির খুশী ভরা মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বললে, আমি পশুর কাছে যাবো!

—না, মা, আমি গিয়ে বলবো, আমার ছোট মেয়ে বিউটিকে আমি দিতে পারবো না। তার চেয়ে মেরে ফেলো আমাকে। কুকুরটাকে প্রথমে দেখতে পাবো বলে আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে।

—না, বাবা, তোমাকে পশুর কাছে যেতে হবে না, আমিই তার কাছে যাবো। সেখানেই থাকবো।

—বিউটি! মা!

—না, বাবা, বাধা দিও না আমাকে। তুমি যে কথা দিয়ে এসেছো। কথা রক্ষা করতে হবেই।

বিউটি এরপর পশুটার বাড়ি চলে গেল। প্রথমটায় সে পশুটাকে দেখে ভীষণ ভয় পেতো। কিন্তু ক্রমে তার ভীতি কেটে যায়। কখনও পশুটা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। ভাল ব্যবহার করতো বিউটির সঙ্গে। বাড়ি আর বাগানটা কত সুন্দর!

পশুটা বিউটিকে কত ভালো জিনিস খেতে দেয়। এতসব ভাল খাবার বিউটি কখনো খায়নি বাবার কাছে।

মাঝে মাঝে তার বাড়ির কথা মনে হয় এবং মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়তো তার বুড়ো বাবা আর দুটি দিদির কথা।

এরপর বিউটি একদিন পশুকে বললে, কয়েক দিনের জন্য বাড়ি যেতে চাই। বাবাকে এবং দুই দিদিকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কথা দিলাম, আবার আমি ফিরে আসবো।

পশুটি বললে, তুমি ইচ্ছে করলেই বাড়ী যেতে পারো। কিন্তু তুমি কোনদিন আমাকে ভালবাসতে পারবে না, তাই না?

তার দুঃখ দেখে বিউটি বললে, না, পশু, আমি সত্যি তোমাকে ভালবাসি। তুমি খুব ভাল ব্যবহার করেছো আমার সঙ্গে। তোমার দয়া মায়া খুব। তোমাকে আমি ভালবাসি।

কথা শেষ করে পশুর মুখের দিকে চাইতে বিউটি দেখতে পেলে এক আশ্চর্য দৃশ্য। পশু নেই। সেখানে দাড়িয়ে একটি সুন্দর তরুণ।

—কে তুমি বলো? আমার পশু কোথায় গেল?

সে বললে, আমি এক রাজ কুমার। একটা ডাইনি বুড়ি আমাকে শাপ দিয়ে পশু বানিয়েছিল।

ডাইনি বলেছিল—যদি কখনো কোন সুন্দরী মেয়ে তোমাকে বলে, আমি তোমাকে ভালবাসি, তখন তুমি আবার এই মানুষের রূপ ফিরে পাবে।

রাজপুত্র বললে, সবাই আমাকে দেখে ভয় পেতো। কে আর ভালবাসবে? ভাবলাম, সারাজীবন পশু হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু তুমি নিজের মুখে বললে তুমি আমাকে ভালবাস, তাই আমিও মুক্তি

পেলাম। বিউটি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমিও তোমাকে ভালবাসি। আমাকে বিয়ে করবে?

বিউটি বাড়ি থেকে ঘুরে এলো। দেখতে দেখতে একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর ছ'জনে মহাসুখে সেই সুন্দর বাগান বাড়িতে রয়ে গেল।

এরপর বিউটির বাবা ও দিদিদের সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। বিউটি পরম সুখী হলো।

বুড়ো চাঁদে গেল

(ইউরোপ)

একটা বুড়ো ছিল। খুব চমৎকার মানুষ সে। সে সুন্দর একটা ছোট রেলগাড়ি বানিয়েছিল। একটা বাচ্ছাদের পার্কে সে গাড়ি চালাতো।

সেই পার্কে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল। রেলগাড়িটা পার্কের চারপাশে ঘুরে বেড়াতো। কত ছেলেমেয়ে ঐ গাড়িতে উঠতো।

বুড়োটা নিজেও গাড়ি চালিয়ে সব বাচ্চাদের পার্কের চারপাশে ঘুরিয়ে আনতো।

একই কাজ রোজ চলে। বাচ্চাদের নিয়ে পার্কের চারপাশে ঘোরা। বুড়ো কিন্তু এই সামান্য পথ ঘুরে খুশী হতে পারতো না।

বুড়ো চাঁদে যাবার স্বপ্ন দেখতো। ট্রেন সোজা ছুটে যাক। এই কথাটা একটা ছোট মেয়ে ট্রেনে উঠে বলে বসে বিস্ময়ের সাথে।

ব্যস। তাই হলো। পার্কের সবাই দেখলো গাড়িটা ঘুরতে ঘুরতে চট্ করে আকাশে উঠে গেল। তারপরই চলতে লাগলো চাঁদের দিকে।

বুড়ো লক্ষ্য করলো, নিচের বাড়ি ঘর পাহাড় পর্বত, মানুষ জন সব ছোট দেখাচ্ছে। আকাশ থেকে এইসব কাণ্ড দেখে বুড়োর মনে আনন্দ আর ধরে না।

গাড়ি উড়ে চলছে তো চলেছেই। চেনা জানা পৃথিবীটা পড়ে রইলো কত নিচে।

যাবার পথে কত তারকার চিকমিকি। প্রতি তারকা থেকে একটি বাচ্চা মুখ বের করে বললে, ওগো বুড়ো দাদু কোথায় তুমি যাচ্ছো?

—চাঁদের দেশে যাচ্ছি।

—এসো না, এখানে বসে একটু জিরিয়ে নাও।

—নাগো, আমার বিশ্রামের সময় নেই। চলতেই হবে আমাকে। চাঁদ যে আমায় ডাকছে। ফিরবার সময় যদি পারি দেখা করে যাবো।

তারকার রাজ্যের ভেতর দিয়ে উড়ে চলে বুড়ো। চাঁদের রাজ্যে পৌছবার আগে থামবো না।

উড়তে উড়তে বুড়ো দেখতে পেলো তার ঠিক সামনেই চাঁদের মা বুড়ী বুড়োটার দিকে চেয়ে হাসছে আর হাসছে।

বুড়ো বললে, আমার রেলগাড়ি চাঁদের বুকে চালাতে দেবেন কি?

এমন এক অতিথি পেয়ে চাঁদের বুড়ী খুব খুশী হলো। হেসে বললে, নিশ্চয়ই দেবো। চাঁদের উপর দিয়ে তুমি যেখানে খুশী চালাতে পারো তোমার রেলগাড়ি।

বুড়োর গাড়ি দেখে চাঁদের ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো। তারা বিস্ময়ে দেখতে লাগলো পৃথিবী থেকে আসা রেলগাড়িটাকে।

বুড়ো খুশী হয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে বললে, দেখছো কি? গাড়িতে চেপে বসো গাড়ি চালাতে শুরু করি।

—কে এই সুন্দর বুড়োটা? চাঁদের ছেলে মেয়েরা অবাক হয়ে ভাবলো।

তাদের মনে এই কৌতুহলটাই বেশ বড় হয়ে দেখা দিল। তারা সবাই গাড়িতে উঠে বসলো একে একে। সবাই খুশী হলো উঠে।

গাড়িটা থেকে ধক্ ধক্ করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। শব্দও হচ্ছে ঝক্ ঝক্-ঝক্!

এবার গাড়িটা চালিয়ে দিল। হুস্-হুস্ ঝক্-ঝক্-ঝক্! গাড়ি ছুটে চললো।

বুড়োর মনে কত আনন্দ। তার এত দিনের স্বপ্নটা আজ সফল হলো। চাঁদের মা বুড়ীও চেয়ে দেখলো গাড়িখানা আর হাসতে লাগলো।

বুড়ো আগে বুড়ীটার চারপাশে ঘুরে চললো। ছেলে মেয়েরা পৃথিবীর ছেলে মেয়েদের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।—কি মজা! কি মজা!

সহসা বুড়োর ঘুম ভেঙ্গে গেল তার গাড়ির চালকের ডাকে। বললে, দাদু, কি হলো তোমার? আজ গাড়ি চালাবে না?

হায়! বুড়োর স্বপ্নটা কেটে গেল! স্বপ্ন! নিজেই স্বপ্ন!

শিমগাছ ও জ্যাক
(ইউরোপ)

বহুকাল আগে একটা ছোট ছেলে ছিল। তাকে সবাই শিমগাছের জ্যাক বলতো। কারণ ছিল, ঐ ছেলেটা বাজারে গিয়ে গরুটার বদলে এক মুঠো শিম বীচি কিনে এনেছিল।

বাড়ী ফিরে বীচিগুলো বাগানে পুঁতে ফেললো। তার চিন্তা ঐ বীচিগুলো থেকে যে গাছ হবে, তা থেকে ভাল শিম পাওয়া যাবে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে জ্যাক দেখতে পেলো যা তাতে সে অবাক হয়ে গেল।

সে দেখতে পেলো, একটা শিমগাছ এত বড় হয়ে গেছে যে, সেটা একেবারে আকাশে ছোঁয়া হয়ে গেছে। গাছের মাথায় কি আছে?

এই ভেবে জ্যাক গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল। উঠছে তো উঠছেই। গাছের যেন শেষ নেই। এক সময় যেতে যেতে মেঘের রাজ্য পার হায় গেল।

একটা বাজনার শব্দ কানে এলো।

এই শব্দটা যেদিক থেকে আসছে সেইদিকে জ্যাক এগিয়ে চললো ক্রমে।

পার হলো অনেকগুলো ঘর। পার হলো অনেকগুলো বারান্দা।

জ্যাক একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঐ ঘরের ভেতর থেকে বাজনার শব্দ আসছে। পর্দাটা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো জ্যাক। ঢুকে দেখতে পেল, একটা বিরাট দৈত্য বসে আছে ঘরের ভেতর।

দৈত্যের একপাশে একটা মেয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। অন্যপাশে একটা মুরগী সোনার ডিম পাড়ছে তো কেবল পাড়ছেই।

এসব কাণ্ড দেখে জ্যাক তো অবাক্ হয়ে গেল। ভাবলো, তার যদি এমন একটা মুরগী থাকতো, তবে সে এমনি অনেক সোনার ডিম পেতো। অভাব থাকতো না।

জ্যাকের মনে কোনরকম ভয় নেই। সে সোজা চলে গেল দৈত্যের কাছে। বুক ফুলিয়ে গিয়ে বললে, আমাকে আপনার মুরগীটা ক'দিনর জন্য ধার দেবেন?

ছোট্ট জ্যককে দেখে দৈত্য বেশ গর্জ্জন করে উঠলো।

এরপর কি হলো জানো?

দৈত্যটা জ্যাককে টুক করে তুলে নিয়ে তার খাবারের স্যাণ্ডউইচের মধ্যে গুজে রেখে দিতে গেল যত্ন করে।

কিন্তু অত সোজা কথা ঐ জ্যাককে ধরা? সে খুবই চটপটে!

একলাফে সে নেমে পড়লো দৈত্যের হাত থেকে। এবার সে চট্ করে মুরগীটাকে বগলে চেপে দিল প্রচণ্ড ছুট!

ছুটতে ছুটতে এসে গেল জ্যাক একেবারে তার শিমগাছটার কাছে।

ভেবে দেখ, কি ছুটেছে জ্যাকটা! তাকে ধরতে পারবে কেন দৈত্যটা?

দৈত্যটা পেছনে তাড়া করে এলো তার বিশাল চেহারা নিয়ে।

শিমগাছটা আকাশ ছোঁয়া। তাই বেয়ে সে তরতর করে নামতে লাগলো নিচের দিকে।

দৈত্যের ভারে শিমগাছটা একেবারে নুয়ে পড়লো এবং বেশ দুলতে লাগলো।

জ্যাকও নামে, দৈত্যও পেছন পেছন নিচে নামছে খুব তাড়াতাড়ি। দূরত্ব অনেকটা।

শিমগাছটা তাদের ভারে এবং দ্রুততায় ভীষণ ভাবে কাঁপছে। কি হয় শেষে দেখা যাক।

জ্যাক ছোট ছেলে। সে যত বেশী তাড়াতাড়ি যেতে পারবে, দৈত্য অতবড় ভারী বিশাল চেহারা নিয়ে তা পারবে কেন?

তাড়াতাড়ি নামতে নামতে শেষে দেখা গেল জ্যাক আগে মাটিতে নামলো।

মাটিতে নেমেই সে দৌড় দিল নিজেদের বাড়ীর দিকে। ভীষণ সেই দৌড়।

বাড়িতে ঢুকেই গেল যেখানে কুড়ুল থাকে সেখানে। তাদের কুড়ুলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি গেল শিমগাছটার কাছে।

তারপর প্রচণ্ড এক কোপে কেটে ফেললো শিমগাছটা। অতবড় গাছটা কাটা পড়লো।

দৈত্যটা তখনও গাছের অনেকটা উঁচুতে ছিল। বিশাল দৈত্যটা গাছের সঙ্গে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রচণ্ড জোরে বিশাল দৈত্যটা পড়ে গেল। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

এদিকে যে মুরগীটা জ্যাক এনেছিল, সেটা রোজ সোনার ডিম পাড়তে লাগলো, তা অনেক হয়ে গেল। অনেক সোনার ডিম।

এই সোনার ডিম দিয়ে তাদের সব অভাব দূর হয়ে গেল। মহাসুখে ওদের দিন কাটতে লাগলো জ্যাকের মুরগীটার জন্য।

পাড়ার যারা গরীব লোক ছিল তাদেরও দুঃখ দূর হয়ে গেল ঐ সোনার ডিম দু'একটা পেয়ে।

এবার সবাই জ্যাকের প্রশংসা করতে লাগলো বারবার। ভাগ্যিস সে শিমগাছ পুঁতেছিল! ভাগ্যিস ঐ গাছ বেয়ে জ্যাক আকাশে উঠেছিল? ভাগ্যিস দৈত্যের ঘরে ঢুকে মুরগীটা নিয়ে এসেছিল? তাই সবার দুঃখ দূর হয়ে গেল।

হ্যানসেল আর গ্রেটেল

(জার্মানী)

এক গরীব কাঠুরে থাকতো একটি বনের ধারে। সেও তার বৌ হ্যানসেল ও গ্রেটেল নামে দুটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে থাকতো।

তারা খুব গরীব ছিল। প্রায়দিন তাদের খাদ্যই জুটতো না। একদিন ঘরে কিছুই খাবার নেই। রাত্রে কাঠুরের বৌ কাঠুরেকে বললে, ছেলেমেয়েদের বনে ফেলে দিয়ে আসতে। নইলে সবাইকে একসাথে না খেয়ে মরতে হবে।

কাঠুরে রাজী হয় না প্রথমে। বৌ তাকে অনেক বলে রাজী করালো। হ্যানসেল তার মা-বাবার পরামর্শ শুনতে পেলো। বুদ্ধি করে সে পকেটে ভরে রাখলো নুড়িপাথর।

পরদিন প্রত্যুষে কাঠুরে দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে বনে গেল। যখন কাঠ কাটাছিল কাঠুরে, তখন দুটি ভাই-বোন খেলা করছিল।

বনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে যখন তারা ঘুমিয়ে পড়লো তখন তাদের বাবা চুপি চুপি বাড়ী চলে গেল। ঘুম ভাঙ্গতে গ্রেটেল কাঁদতে লাগলো।

হ্যানসেল নামে ছেলেটা বোন গ্রেটেলকে বললে, কাঁদিস না। আমরা বনে হারিয়ে যাবো না। আমার কাছে নুড়িপাথর ছিল, তাই পথের ধারে ফেলতে ফেলতে এসেছি।

তারা সেই চিহ্ন দেখেই বাড়ী ফিরলো। পরদিন তাদের নিয়ে

বাবা আবার বনে গেল। সেদিন পকেটে রুটির টুকরো নিয়ে গেল হ্যানসেল।

সেদিন বনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। বাবা তাদের বনে রেখে চলে গেল। সেদিন হ্যানসেল বাড়ি ফেরার পথ পায় না।

ফেলে আসা রুটির টুকরোগুলো পাখীরা একে একে খেয়ে গেছে। এদিকে ওদিক ঘুরতে ঘুরতেই পথ হারিয়ে ফেলে।

গ্রেটেল তখন ভীষণ কাঁদতে শুরু করলো। শান্ত করতে চেষ্টা করে হ্যানসেল।

বনের মধ্যে অনেক পথ ঘুরে দেখতে পেলে একটা কুঁড়েঘর। আদার রস মেশানো রুটি দিয়ে তৈরী ঘরটা। এতপথ হেঁটে ওদের খিদে পেয়েছে।

তারা লোভ সামলাতে পারলো না। এই কুঁড়েঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে একটুকরো করে মুখে পুরলো। তাতে কি আর পেট রে? তাই বারবার খেলো।

তখন কুঁড়েঘরের দরজটা খুলে গেল। দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল এক বেটে বুড়ী।

—খোকা-খুকু, ভেতরে এসো। তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে বুঝি? আমি খেতে দেবো। খেয়ে আমার ঘরে গরম বিছানায় ঘুমাও। কোন কষ্ট নেই। বুড়ীটা বললো।

বুড়িটা যে একটা ডাইনী তা ওরা বোঝেনি, তাই তার ঘরে ঢুকে পড়লো।

পরদিন সকালে বুড়ি তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুললো। গ্রেটেলকে ঘর পরিষ্কার করতে বললো, হ্যানসেলকে একটা ছোট খাঁচায় আটকে রাখলো। বললে, তুই যখন বেশ মোটা হবি তখন তোকে খাবো।

ভয়ে গ্রেটেল কান্না শুরু করে দিল। তাতে বুড়ীর গ্রাহ্যও নেই। ডাইনীর কথা মত গ্রেটেল সব কাজ করতে থাকে।

ডাইনী যখন বাইরে গেছে তখন দুটি ভাই বোন মিলে বুদ্ধি

করলো। গ্রেটেল বোনটি ভাই হ্যানসেলকে একটা আঙ্গুলের মত সরু লম্বা হাড়ের টুকরো দিল।

রোজ ডাইনি আসে সকালে হ্যানসেলের খাঁচার কাছে। বাইরে থেকেই বলে, দেখি হ্যানসেল কতটা মোটা হয়েছে।

হ্যানসেল সরু হাড়টা বের করে দেখায়। যেন তার আঙ্গুল দেখাচ্ছে ডাইনীকে।

এখনও এত রোগা আছিস? আর একটু মোটা হোলে তবে তোমাকে খাবো।

তারপর চলে যায় নিজের কাজে। একদিন ডাইনী বুড়ী মেয়েটাকে বললে রুটী সেঁকতে। আসল কথা, ডাইনী বড় উনুনে রুটি সেঁকতে চাইতো না। কারণ বড় তাপ লাগতো তাতে কষ্ট হতো খুব।

তাই গ্রেটেলকে দিয়ে রুট তৈরী করাতো। একটা ফন্দী করলো গ্রেটেল। রুটী সেঁকতে জানে না এই ভান করলো। ডাইনী বুঝলো না যে গ্রেটেল না জানার ভান করছে। তাই তাকে রুটী সেঁকা শেখাতে যায়। বলে, ঠিক এইভাবে সেঁকতে হয়।

ডাইনী উনুনটার খুব কাছে ছিল। গ্রেটেল তার পেছনে দাঁড়িয়ে উনুনটার ঢাকনা বন্ধ করে দিল। অমনি বিকট আর্তনাদ করে ডাইনী পুড়ে মরলো।

গ্রেটেল আনন্দের ধ্বনি করে হা-হা-হা! দৌড়ে গিয়ে ভাই হ্যানসেলের খাঁচার দরজা খুলে দেয়। বোন বের হয়ে আসে।

তারপর দুজনে মিলে ডাইনীর সিন্দুক খুলে মনিমুক্তা অনেক গুলো নিয়ে পকটে ভরলো। তারপর কুঁড়ে থেকে বের হয়ে দু'জনে বনের পথে চলতে থাকে। ক্রমে এসে দাঁড়ায় এক হ্রদের সামনে।

এখন তারা কি করে এগোবে? একটা বড় হাঁস সাঁতরে দুই ভাই বোনকে পাড় করে দিল।

তারপর কিছুদূরে গিয়ে ওরা তাদের বাড়ী খুঁজে পেলো।

নিজেদের বাড়ি খুঁজে পেয়ে দুটি ভাইবোন মহাখুশী হলো।

তার বাড়ীর দরজায় গিয়ে বাবাকে ডেকে বলে বাবা, দেখ কত মনি-মুক্তো এনেছি!

ছ'জনেই আনন্দে চীৎকার করে আর হাসে। হ্যানসেল ও ও গ্রেটেল আনন্দে মেতে ওঠে।

কাঠুরে এসে সব দেখে আনন্দে মেতে ওঠে, বললে—বাঃ! এত মনিমুক্তো! আমরা যে বড়লোক হয়ে গেলাম, হ্যানসেল ও গ্রেটেল আর আমাদের খিদে পেলে কষ্ট পেতে হবে না। আমরা সবাই আনন্দে একসঙ্গে থাকতে পারবো।

সবাই খুশী হলো। এরপর থেকে কাঠুরে আর তার বৌ ছুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মহাসুখে দিনগুলো কাটতে লাগলো।

মনি-মুক্তোগুলো শহরে নিয়ে গিয়ে একটা করে বিক্রী করে এলো এবং দিনের পরদিন আনন্দে কাটালো।

একটি মজার মামলা

(আফ্রিকা)

বহুদিন আগের কথা। অফ্রিকার এক গ্রামে ছুটি বন্ধু পাশা-পাশি থাকতো। এদের একজন বড়লোক, অপবজন গরীব।

সেই অঞ্চলে একবার ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হা-অন্ন, হা-অন্ন রব উঠলো চারিদিকে। খিদের জ্বালায় গরীব বন্ধুটি গেল বড়লোক বন্ধুর বাড়ি।

সে ভাবলো, এমন বিপদের দিনে বন্ধু কি তাকে সাহায্য করবে? হয়তো করবে।

গরীব বন্ধুর ধারনা ভুল হলো। ধনী বন্ধুটি তাকে খেতেতো দিলই না বরং গালাগালি করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। তাই গরীব বন্ধুর খুব ছুঃখ হলো। কিন্তু কি করবে সে রাগ করে।

না খেয়ে দিন কাটতে লাগলো গরীব বন্ধুটি। দিনের পর দিন না খেয়ে তার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেল।

তার এই অবস্থা দেখে একজনের দয়া হলো। সে এই গরীব লোকটিকে কিছু ভুট্টা দিল। সেগুলো নিয়ে লোকটা আনন্দে বাড়ি এলো। বৌকে দিলে ভুট্টাগুলো।

সেগুলো দিয়ে বৌ খাবার বানিয়ে দিল। গরীব সে। তাই ঘরে না ছিল তেল না ছিল কোন মশলা। তার ঘরে একটু নুনও ছিল না।

তাই বৌয়ের রান্না তার ভালো লাগলো না। লোকটি ভাবলো আর একবার গিয়ে দেখি ধনীবন্ধুর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

আগের সে দিন গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে বন্ধুটি খারাপ ব্যবহার করেছে নিশ্চয়ই হয়তো সেদিন কোন কারণে তার মন খারাপ ছিল। আজ হয়তো ভাল ব্যবহার সে নিশ্চয় করবে এবং তাকে সাহায্য করবে।

ধনীবন্ধুর বাড়ীতে তখন রান্না হচ্ছিল। রান্নার সুঘ্রাণ চারিদিকে ভরে গেছে। সেই গন্ধে গরীর বন্ধুর খিদে বেড়ে গেল।

দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ভুট্টার তৈরী নুন-মশলা ছাড়া খাবারগুলো সে নিয়ে এলো। এখানে ধনীবন্ধুর বাড়ীর রান্নার ঘ্রাণ নিতে নিতে বাড়ির খাবারগুলো! বেশ খেতে লাগলো।

খাওয়া শেষ হলে সে বাড়ীর দিকে রওনা দিল প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে।

তারপর কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন এই গরীব বন্ধুটির সঙ্গে ধনী বন্ধুটির দেখা হয়ে গেল। ধনীটা তাকে এড়াতে চেষ্টা করলো।

গরীব বন্ধুটি সামনে এসে দাঁড়ায় মাথা নিচু করে। ধনীবন্ধু বললে তোমার কি চাই? আমি তো সেদিনই বলে দিয়েছি যে, কোন সাহায্য করতে পারবো না।

—না, কিছু চাই না। আমাকে একজন অনেক ভুট্টা দিয়েছে। আপাততঃ আমার খাবারেই অভাব নেই।

—পথে আমাকে আটকালে কেন?

—একটা মজার কথা বলবো বলে। গরীব বন্ধুটি বললে ধনীকে।

—কদিন আগে তোমার বাড়ীর উল্টোদিকে বসে অনেকখানি সিদ্ধ ভুট্টা খেয়েছি। তাতে কোনরকম মশলা বা একটুখানি নুন পর্যন্ত ছিল না। তবু খেতে কোনই অসুবিধা হয়নি।

—কারণ কি ? ধনীটি প্রশ্ন করে।

—কারণ তোমার বাড়ীর চমৎকার রান্নার ঘ্রাণ আসছিল। সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেদ্ধ ভূট্টাগুলো খেয়ে ফেললাম।

ধনীলোকটি খুশী হলো না, আরো রেগে গেল। বললে, তুমি ছোটলোক। আমাদের খাবারের গন্ধ চুরি করেছ ? তাই আমার খাবারের কোন গন্ধ পেলাম না। এইভাবে তুমি আমার ক্ষতি করছো। ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

কি করে ক্ষতিপূরণ দেবো আমি ? আমি যে অতি গরীব।

সেকথা শুনবো না। চলো তবে এখনি বিচারকের কাছে।

দু'জনে গেল বিচারকের কাছে। সব কথা শুনে বিচারক বললে গরীব লোকটির দিকে চেয়ে তুমি যে দোষী। জরিমানা দিতে হবে তোমাকে।

মহাশয়। আমি দরিদ্র, আমি কি জরিমানা দেবো ?

তা শুনে বিচারক বললেন, তোমাকে একটা ছাগল দিতে হবে। তুমি এই ধনীকে দেবে ওটা।

আমি খেতে পাই না। ছাগল কিনবার পয়সা কোথায় পাবো ? কেঁদে ফেললে সে।

বাড়ি যাও, ছাগল জোগার করো গিয়ে।

গরীব লোকটি বাড়ি ফিরলো। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। সে বললে, কি গো, তোমার চোখে জল কেন ? কি হয়েছে তোমার ?

এবার তার কাছে সব কথা খুলে বললো। এই লোকটি বেশ চালাক। আইন-কানুন বেশ ভালো জানে। সে একটু ভেবে বললে, তোমাকে আমি সাহায্য করবো।

—হ্যাঁ, আমাকে রক্ষা করো।

—আমি একটি ছাগল দেবো। জরিমানার দিন পর্যন্ত ওটা তোমার কাছে থাকবে। তারপর আমার ছাগল আমি ফিরিয়ে নেবো।

জরিমানার দিনটা বিচারক আগেই ঠিক করেছিলেন। বিচারের দিনে বহু লোক এসেছে দেখতে। সবাই এসেছে গন্ধ চুরির অপূর্ব মামলার বিচারটা দেখতে। ভীড়ের ভেতর গরীব লোকটির বন্ধুও আছে।

বিচারক এসে তাঁর আসনে বসলেন।

গরীব লোকটির বন্ধুটি বললে, হুজুর কিসের মামলা এটা?

গন্ধ চুরির মামলা। গরীব লোকটি এই বড়লোকটির খাবারের গন্ধ চুরি করেছে।

—এরজন্য কি শাস্তি হবে? লোকটি জিজ্ঞাসা করলো।

—গরীব লোকটিকে একটি ছাগল জরিমানা দিতে হবে।

—ছাগলটা কে পাবে হুজুর?

—বড়লোকটি পাবে। বিচারক জবাব দেয়।

হুজুর, এটাতো ঠিক বিচার হলো না।

তোমাকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। বিচারক রেগে বললেন তাকে।

লোকটি বিচারকের সঙ্গে আর একটি কথাও বললে না। ভীড়ের দিকে চেয়ে বললে, আমার বিচার কি তোমরা শুনবে?

অবশ্যই শুনবো। তুমি যদি বিচার করো ঠিক শুনবো আমরা।

—শোন গরীব লোকটি ধনী এই লোকের খাবারের গন্ধটুকু নিয়েছিল।

—হ্যাঁ।

খাবার খায়নি কিছু।

—ঠিক কথা।

—তাহলে গরীব কেবল খাবারের গন্ধ ফেরৎ দেবে।

—সেটাই তো উচিত। তার বেশী কিছু আশা করা যায় না। একজন বুড়ো তখন বললে।

লোকটি এবার ধনীলোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, ছাগলটা তুমি দেখতে পাচ্ছো ?

হ্যাঁ, পাচ্ছি।

বন্ধুটি এবার একটি লাঠি দিয়ে ছাগলটার পিঠে কয়েকটা ঘা দিলে। ছাগলটা ব্যা ব্যা করে কয়েকবার ডেকে উঠলো।

—কি শুনলে ?

—ছাগলের ডাক।

—সব তাহলে শোধ হয়ে গেল। ব্যস মামলা শেষ হয়ে গেল। ছাগলের ডাকের শব্দ পেয়েছো তাই গন্ধ শোধ হয়ে গেল।

—মানে ?

এই লোকটি খাবার খায়নি, গন্ধ পেয়েছে। তুমিও ছাগল খাওনি তার ডাক কানে শুনছো। সে নাকে ঘ্রাণ নিয়েছিল, তুমি কানে ডাক শুনলে। দু'জনের কেউ কিছু খাওনি। শোঁকা আর শোনায় শোধ হলো।

ভীড়ের মধ্যে সবাই এই বিচার মেনে নিল। বিচারক আর ধনীলোকটি কিছু বলতে পারলে না।

নির্ভিক জন

(ইউরোপের রূপকথা)

এক গ্রামে জন নামে একটি নির্ভিক ছেলে ছিল। ছেলেটার গায়ে ছিল খুব জোর আর মাথায় খুব বুদ্ধি ছিল। ভয়ঙ্কর কাকে বলে তা সে জানে না। সেজন্য সবাই তাকে নির্ভিক জন বলতো।

এক রাতে সে নিজের সাহস পরীক্ষা করার জন্য একটা বনে গেল।

সেটা সাধারণ বন নয়। লোকে বলে, সেই বনে রাতে হাজার ভূত ঘুরে বেড়ায়।

জন ঠিক করলো সে ভূতুরে বনে ঘুমাবে। বনের ভেতর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত শোনা গেল না। কোন জন্তু জানোয়ার বা মানুষ দেখা যায় না।

এই নির্জনতায় ও বিভীষিকায় জন একটু ভয় পেলো না। ভূতুরে বনে একরাত ঘুমিয়ে সকালে সে তার বুক ফুলিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

গ্রামে ফিরতেই সবাই বিস্মিত। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী লোকও ঐ বনে সারারাত কাটাবার কথা ভাবতে পারে না। সবাই ছেলেটিকে প্রশংসা না করে পারলো না।

এবার জন ঠিক করলো যে,- সে এবার- মহাআতঙ্কপুর্ণ প্রাসাদ দূর্গে তিনরাত কাটাবে। হ্যাঁ, ওখানে তেমনি একটা প্রাসাদদূর্গ ছিল। সেই দূর্গে কোন লোকজন ছিল না। কেউ সেখানে থাকতে পারতো না।

সেই দূর্গে ছিল নানারকম ভয়। সেজন্য ঐ দূর্গের নাম হয়েছিল আতঙ্কের প্রাসাদদূর্গ। সেই দূর্গে তিনটি রাত কাটাবার পেছনে আর এক কারণ ছিল। দেশের রাজা ঘোষণা করেছিলেন যে ঐ প্রাসাদে যে তিনবার কাটাবে, সেই সাহসী পুরুষের সঙ্গে রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন।

তাই রাজার জামাই হতে কে না চায়? জনও তাই চাইলো অর্থাৎ রাজার জামাই হতে।

প্রয়োজনীয় জিনিস এবং তিনদিনের মত খাবার সঙ্গে নিয়ে সাহসী জন চললো আতঙ্কভরা ঐ প্রাসাদদূর্গের দিকে।

সন্ধ্যার মুখে জনহীন দূর্গের সামনে এসে গেল জন। নিস্তব্ধ চারিপাশ! কোনদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। জন একটুও ভয় পেলো না। নির্ভয়ে ঢুকলো সে প্রাসাদদূর্গে।

ক্রমে রাত হলো। রাত বাড়লো। এলো ভূত। এলো প্রেত্নী।

এলো তাদের ছানারা। তারা নানারকম ভাবে ভয় দেখাতে লাগলো জনকে।

তারা জানে না যে জন কত বড় সাহসী। মুগুর নিয়ে জন তাদের তাড়া করলো। ভূত-প্রেত্নী বাচ্ছাদের নিয়ে পালিয়ে গেল তার কাছ থেকে। ভয় দেখাতে এসে তারা ভয় পেলো।

সেইরাতে আর কোন উৎপাত হোল না? সেরাত কাটলো। দ্বিতীয় রাতে সেই প্রাসাদ-দূর্গে হলো এক বিরাট ভাল্লুক। ভাল্লুকটা জনকে জড়িয়ে কামড়ে দেবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু বীর জনের সঙ্গে কে পারবে? সে কৌশলে ভাল্লুকের আক্রমণ এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে চললো। কিছু সময়ের ভেতর ভালুক হেরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

বীর জন তার মুখ ও চারটি পা ভালো করে বেঁধে ফেললে। সেই রাতে আর কোন উৎপাত হলো না। এর পর দুটো রাত ভালভাবে কাটলো।

তৃতীয় রাতে এলো এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন। সাহসী জন নির্ভয়ে তার মুখোমুখি হলো। ড্রাগনটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই জন চট করে একসাশে সরে গেল। ড্রাগন ঘুরে দাঁড়ালো।

তারপর জনের মুখোমুখি হতেই জন তার গায়ে বেশ কয়েকটা মোক্ষম ঘুষি মেরে অন্য দিকে সরে গেল। এমনি করে বুদ্ধির দ্বারা আর ঘুষির দ্বারা জন ভয়ঙ্কর ড্রাগনটার সঙ্গে লড়াই করে চললো।

লড়াই করতে করতে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে দৌড়ালো। তারপর এক মহল থেকে আর এক মহলে গেল।

এমনি করে জন এবং সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগন সমস্ত প্রাসাদ-দূর্গে ছোটা-ছুটি করতে লাগলো।

মার খেতে খেতে ড্রাগনটা সেই বিরাট প্রাসাদ-দূর্গে বহুবার ছুটলো ও ঘুরলো। ফলে তার মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগলো।

একসময় সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সেই দুর্গের মেঝেতে।

তখন জন মহাবীর জন। তাকে আর পায় কে? বিরাট জয় তার।

এবার সে ঐ ভয়ঙ্কর ড্রাগনটাকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। যাতে সে আর পালাতে না পারে।

সেই রাতে আর কোন উৎপাত হলো না।

এইভাবে পর পর তিনটি রাত কেটে গেল। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

দেশের রাজা শুনলেন সাহসী জনের কাহিনী। বিভীষিকাময় প্রাসাদদূর্গে জন পরপর তিন রাত কাটিয়েছে।

তারপর তাকে ডাকিয়ে আনলেন। তার কাছে শুনলেন সে কি করে কাটিয়েছিল ঐ তিনটি রাত ভয়ঙ্কর প্রাসাদদূর্গে।

একে একে সব কথা শুনলেন রাজা। একজন সত্যিকারের বীর ছেলে আছে, সে নির্ভীক।

রাজকন্যার জন্য এমন একজন সাহসী পাত্র দরকার। মহাবীর জন! এমন ছেলে আর দ্বিতীয় নেই।

এরপর একটা শুভদিন দেখা হলো রাজাও রানীর আদেশে। দিন দেখা চললো।

তারপর সেই শুভদিন বীর জনের সঙ্গে রাজা নিজের সুন্দরী কন্যার বিয়ে দিলেন।

এই রাজকন্যা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী।

সবাই এই রাজকন্যাকে বলতো উপত্যকার লিলিফুল! এত চমৎকার দেখতে!

সুন্দরী বৌকে পেয়ে নির্ভীক জন খুব খুশী হলো। সে যেন চাঁদ হাতে পেলো।

গ্রামের নির্ভীক জনকে এখন আর পায় কে ? তার গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রাজ্যেও একটা রীতিমত একটা আলোড়ন স্থষ্টি হলো।

সেই নির্ভীক জনকে অনেক দেখতে আসে। তাকে কি আর দেখা পাওয়া যায় ?

বিউলফ্

(এাংলো স্যাক্সন উপকথা)

বহুকাল আগের কথা। তখন ডেনমার্কে কোন রাজাই ছিল না। একদিন একটি জাহাজ সাগরের জলে ভাসতে ভাসতে ডেনমার্কের উপকূলে এসে থামলো।

জাহাজের ভেতর অনেক ধনদৌলত টাকা পয়সা ছিল। আর ছিল অনেক অস্ত্র। এছাড়া জাহাজে একটা শিশুটা ঘুমিয়ে ছিল।

জাহাজের লোকেরা ধন দৌলত, অস্ত্র শস্ত্র নামালো এবং ঘুমন্ত শিশুকেও নামালো।

সেই শিশু একদিন বড় হলো। সে হলো দেশের রাজা এবং তার নাম হলো স্কিলড্।

অনেকদিন রাজত্ব করবার পর মারা গেলে লোকেরা জাহাজে করে তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল। সাগরের পথে রাজা এসেছিলেন একদা। তাই সাগরের জলে গেল তার মৃতদেহ।

রাজা স্কিল্ডের বংশেই জন্মেছিলেন এই রাজা হ্রথগার। বুড়ো বয়সে তাঁর সখ হলো তিনি এমন একটি প্রাসাদ তৈরী করাবেন তেমন প্রাসাদে কোনদিন কোন রাজা থাকেননি।

রাজার আদেশে নতুন প্রাসাদ তৈরী শুরু হলো। কত মিস্ত্রী কত কারিগর কাজে লেগে গেল।

তারপর অল্পকালের ভেতর সাগরের তীরে একটা পাহাড়ের মাথায়

গড়ে উঠলো রাজা হ্রুথগারের একটি নতুন প্রাসাদ। প্রাসাদটি ছিল চমৎকার।

শুধু কাঠ দিয়ে তৈরী হলো সেটা। তার ছাদটা সোনার মত চকচকে। ছাদের কিনারায় দেওয়ালের ত্রিকোণা অংশটা বেশ চাওড়া।

থামগুলো নানারঙে বেশ রঙীন। সেগুলোর উপর আবার কত রকমের কারুকার্য। ঐ প্রাসাদে চূড়া আর কোণাগুলো হরিণের ডালপালাওয়ালা শিং দিয়ে সাজানো।

এই রাজা হ্রুথগার নতুন এই প্রাসাদের নাম দিলেন হেরট। এর অর্থ হলো পুরুষ হরিণ।

নতুন প্রাসাদে গিয়ে হ্রুথগার একটা বড় উৎসবের আয়োজন করলেন। সেই উৎসবে আত্মীয় স্বজন আর বন্ধু বান্ধবদের অনেক দামী উপহার দিলেন।

এছাড়া ভোজের ব্যবস্থা তো ছিলই। খাওয়ার পর বেজে উঠলো বীণার বাদন, সুরু হলো গান।

সেই গানের সুর, সেই মধুর বাজনার শব্দ শুনতে পেলো গ্রেণ্ডেল নামে এক শয়তান দানব। কুয়াশাভরা জালভূমি আর প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় সেই হিংস্র দানব।

মানুষের রাজে এত উৎসব এবং আনন্দ দেখে দানবের মনটা হিংসায় গেল ভরে। ভাবলো সে এদের এই আনন্দ বন্ধ করতেই হবে।

ক্রমে রাত হলো। অন্ধকার দেখা দিল। দানব গ্রেণ্ডেল চললো নতুন রাজবাড়ির দিকে। রাজবাড়ীর হলঘরে ঘুমিয়ে ছিল ত্রিশজন যোদ্ধা।

তারা কাউকে ভয় করে না। দানব এই গ্রেণ্ডেল নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করলো। তারপর ঐ মৃতদেহগুলিকে নিয়ে চলে গেল সমুদ্রের নিচে।

পরদিন প্রভাতে রাজা হ্রুথগারের চাকররা এলো হলঘর পরিষ্কার

করতে। কি অদ্ভুত কথা! হলঘরে কোন বীর নেই। টেবিল চেয়ারে উল্টে পাল্টে আছে। সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়েছে।

কাল রাতে যে এখানে দারুণ একটা আলোড়ন হয়েছিল। বড় বড় পায়ের ছাপ রয়েছে মেঝেতে। কোন মানুষের গায়ের ছাপ নয় এগুলো।

রাতের অন্ধকারে কোন দানব এসে হানা দিয়েছিল এই নতুন রাজবাড়ীতে। সবার মন দুঃখে ভরে গেল। ত্রিশজন যোদ্ধার জন্য সবাই দুঃখ করতে থাকে।

পরের দিন রাতে আবার হানা দিল সেই দৈত্য। সে রাতের জন্য বীর যোদ্ধারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু কি হবে তাতে?

দেখা গেল বীরদের কোন অস্ত্রই দৈত্যটার গায়ে বিঁধছে না। নিষ্ঠুরভাবে তাদের মেরে ফেলে দাবন গ্রেণ্ডেল তাঁদের মৃতদেহগুলি নিয়ে গেল সাগরের তলে।

রাজা হ্রথগার বুড়ো হয়েছেন ক্রমে। ভয়ঙ্কর দৈত্য গ্রেণ্ডেলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত শক্তি তার নেই। অনেক ভেবে তিনি ঠিক করতে পারলেন না যে, কি করে দৈত্যটাকে বধ করা যায়।

রাজাকে এত চিন্তিত দেখে কজন বীরযোদ্ধা বললে, কিছু ভাববেন না মহারাজ, আজরাতে খোলা তলোয়ার হাতে হলঘর পাহারা দেবো, দেখা যাক, দৈত্য কি করতে পারে!

তাদের কথায় রাজা হ্রথগার আশ্বস্ত হতে পারলেন না।

পরদিন সকালেও একই দৃশ্য দেখা গেল। সমস্ত হলঘর রক্তে ভরে গেছে। সব আসবাসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। বীর যোদ্ধাদের কেউ নেই হলঘরে।

এবার সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। আর কোন যোদ্ধাই সাহস করে না রাজবাড়ীর হলঘরে থাকতে। অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাজবাড়ি ছেড়ে সবাই চলে যেতে চায়।

তাই রাজা হ্রথগারকে নতুন প্রসাদ ছাড়তে হলো। রাজার এত সাধের বাড়ি একেবারে যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বারো বছর ধরে শয়তান গ্রেণ্ডেল হানা দিয়ে চলছে নতুন রাজ বাড়িটাতে। এই উৎপাতের কথা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে ও বহু দেশে।

মহাবীর বিউলফ শুনলে এই দৈত্যর অত্যাচারের কথা। তিনি একটি জাহাজে চড়ে এলেন হ্রথগারের রাজ্যে। ডেনদের রক্ষা করবেন তিনি।

রাজা হ্রথগার খবর পেয়ে বিউলফকে খুব আদর যত্ন করলেন—যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। দেখা যাক বীর এবার কি করে?

রাতের অন্ধকার নেমে এলো।

বিউলফ ঠিক করলেন, সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি নতুন প্রাসাদেই রাত কাটাবেন। রাজা তাঁকে খুব সতর্ক করে দিলেন দৈত্যটা সম্পর্কে।

জনহীন রাজপ্রসাদে আবার লোকজন দেখে রাজার খুব আনন্দ হলো। মাঝরাতে দৈত্যটি আবার হানা দিল।

বিউলফের একজন অনুচরের দেহ সে টেনে ছিঁড়ে ফেললো দৈত্যটি এবার বীর যোদ্ধা বিউলফের দিকে এগোলো।

হাত এগোতেই সে বুঝতে পারলো এ শক্ত কাজ। কে যেন তারই হাত চেপে ধরেছে। আসলে বীর বিউলফের দেহে ছিল ত্রিশটি বীরের শক্তি।

দানব গ্রেণ্ডেল বীর বিউলফের শক্ত হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়াবার জন্য খুব বেশী টানাটানি করতে লাগলো।

কিন্তু লোহার মত হাতের শক্ত মুঠি সে কোনমতেই ছাড়াতে পারলো না।

দৈত্য গ্রেণ্ডেলের এবার ভয় হলো। এমন শক্তি ও সাহস আগে কারো দেখেনি। একটা মানুষের গায়ে এত শক্তি!

দৈত্যটা দারুণ ছটফট করতে লাগল। তার ছটফটানিতে হলঘরটা যেন কেঁপে উঠলো।

ঘরের আসবারপত্র ভেঙ্গে গেল। বিউলফের শক্ত মুঠির বন্ধনে বাঁধা দৈত্যটা বীভৎস্যভাবে চীৎকার করে উঠলো।

সহসা দেখা গেল বিউলফের একটানে গ্রেণ্ডের একটি হাত খসে পড়েছে। যন্ত্রনায় চীৎকার করতে হিংস্র দৈত্যটা সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রাণ রক্ষা করতে।

কিন্তু সে প্রাণে বাঁচলো না। বিউলফ এই দৈত্যর ছেঁড়া হাতখানা হেরট' প্রাসাদের ছাদের নিচে ঝুলিয়ে রাখলো। ডেনরা বিউলফের বীরত্বে মুগ্ধ হলো।

এবার রাজা হ্রথগার বীর বিউলফের প্রতি সম্মানে বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। গান-বাজনা চললো। সবাই আজ আনন্দিত, সবাই খুশী।

রাজা হ্রথগার বীর বিউলফকে একটি সোনার পতাকা বুকের বর্ম শিরস্ত্রাণ তলোয়ার এবং বহু জিনিস উপহার দিলেন।

বীরের সঙ্গীদেরও বহু পুরস্কার দিলেন—রাজা হ্রথগার। রানীও বীর বিউলফ ও তার সঙ্গীদের উপহার দিলেন। তাঁরা খুব খুশী।

গ্রেণ্ডেলের মা ছিল ভয়ঙ্কর দানবী, সমুদ্রের গভীর তলে অন্ধকারে সে থাকে। ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এবার সে হানা দিল হেরট প্রাসাদ।

রাজা হ্রথগারের এক প্রিয় যোদ্ধাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো দানবী। আর এক বীরযোদ্ধাকে টেনে নিয়ে চলে গেল সাগরের তলায়।

এবার বীর বিউলফকে সঙ্গে নিয়ে রাজা হ্রথগার নিজেই বেরিয়ে পড়লেন এক জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে।

পাহাড়ের নিচে কালো জলরাশি। জল ফুটছে টগবগ করে। সেই জলে সাঁতার কাটছে বড় বড় পোকার মত প্রাণী, সমুদ্র ড্রাগন আরো কত বিভৎস্য জন্তুরা।

মহাবীর বিউলফ সেই ভয়ঙ্কর জলে ঝাঁপ দিলেন। অমনি একটি বিরাট দাঁড়াওয়ালা সাঁড়াশী তাঁকে চেপে ধরলো।

সেই ভীষণ সাঁড়াশী তাঁকে টেনে নিয়ে গেল জলের তলায়। এবার দৈত্য গ্রেণ্ডেলের মা তার পুত্রহত্যাকারীকে খুঁজে পেয়েছে।

সমুদ্রের তলায় এক বিরাট গুহা, সেখানেই থাকে গ্রেণ্ডেলের মা ভয়ঙ্করী দানবী। এবার সেই দানবী আর বিউলফের সঙ্গে যুদ্ধ হলো।

বহুক্ষণ ধরে দু'জনের যুদ্ধ চললো। মহাবীর বিউলফ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বুঝিবা এই দানবীর হাতে সাগরতলে তাঁকে মরতে হবে।

না-না, ভগবান তাঁর সহায়, এই দানবী তাঁকে মারবে কি করে। লড়তে লড়তে বিউলফ দেখতে পেলেন দেওয়ালে নানা অস্ত্র সস্ত্র ঝোলানো। তলোয়ারও আছে বড় একটা।

এ হলো দানবদের যাদু তলোয়ার কোন মানুষের পক্ষে এত বড় তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। একলাফে বিউলফ তলোয়ারটা হাতে তুলে নিলেন।

তারপর আঘাত হানলো দানবীকে, সেই আঘাতেই দানবী প্রাণ হারালো।

গ্রেণ্ডেলের মৃতদেহটা তার ভেতর পড়ে রইলো। বীর বিউলফ তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে চললেন রাজার কাছে। তাঁকে উপহার দেবেন।

এই দানবীর রক্তে সমুদ্রের জল রাঙা হয়ে গিয়েছিল। কত অত্যাচার করেছিল এই দানবী।

ডেনরা ভেবেছিল যে এই দানবীর সঙ্গে যুদ্ধে বীর বিউলফ নিশ্চয়ই মারা গিয়েছেন। জল লাল হয়েছে তাঁরই রক্তে।

তাই ডেনবাসীরা খুব দুঃখ করছিল মহাবীর বিউলফেব জন্য।

যখন দানবীর কাটা মুণ্ডুটা হাতে নিয়ে এবং তলোয়ার হাতে যখন মহাবীর বিউলফ এলেন রাজার কাছে, তখন চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।

মহাবীর বিউলফকে নিয়ে রাজারানী আনন্দে মেতে উঠলেন। সভাসদরা পর্যন্ত এই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। মহাবীর বিউলফের জয় হলো।

সূর্যঠাকুরের দুর্দশা

নাইজিরিয়া

তোমরা এখন সূর্যকে দেখতে পাও আমাশে। সাগর থাকে নিচে।

বহুকাল আগে সর্যদেরও নিচেই থাকতেন। তার সঙ্গে সূর্যদেবের খুব সদ্ভাব ছিল। সূর্য্যদেব প্রায়ই সাগররাজের বাড়ীতে বেড়াতে যান।

কিন্তু সাগর কখনো তাঁর বাড়ীতে যেতেন না। তাই সূর্যঠাকুরের মনে খুব দুঃখ ছিল।

একদিন তিনি তাই সাগরকে গিয়ে বলেন, ভাই সাগর, তুমি আমার বাড়ীতে আসছো না কেন বলতো? তুমি এলে খুশী হতাম।

সাগর বলে, দেখভাল সূর্য, আমার তো খুব যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে যদি যাই তাহলে কি তুমি থাকবার জাগা দিতে পারবে? তাই তো আমি যাই না। আমাকে এজন্য ভুল বুঝোনা বন্ধু।

—বেশ, তোমাদের থাকবার ব্যবস্থা আমি করে দেবো কথা দিচ্ছি।

—বেশ, করো। তোমার উঠোনটা যে খুব ছোট, সেটাকে বড় করতে হবে। তবে আমি সপরিবারে তোমার ওখানে যেতে পারবো।

সূর্যঠাকুর বললে, আচ্ছা তাই করবো।

—বেশ, উঠোন ঠিক হয়ে গেলে আমাকে খবর দেবে সাগর বললেন।

সূর্যিঠাকুর বৌ-চাঁদকে বললেন, গিন্নী ঐ সাগরবন্ধুকে আজ নেমন্তন্ন করে এলাম। সে তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসবে।

—ভাল কথা চাঁদবৌ জবাব দিলেন।

একটা অসুবিধে আছে আমার, সূর্য বললেন।

—কি তোমার অসুবিধা? চাঁদবৌ সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমাদের এই উঠোনটা যে ছোট। সাগরের বাড়ীর সবাই এলে ওইটুকু জায়গায় কুলাবে না।

—তবে উঠোনটা বড় করে দাও।

—ঠিক তাই করবো ভাবছি, সূর্য জবাব দিল চাঁদবৌকে।

ভাল কাজ করবো বলে ফেলে রাখতে নেই। তাই পরদিন থেকেই সূর্যঠাকুর উঠোনটাকে বাড়াতে সুরু করে দিলেন।

কয়েকদিনের ভেতর মস্তবড় উঠোন হয়ে গেল। সূর্যদেব ভাবলেন এই বিশাল জায়গায় নিশ্চয়ই সাগর রাজার সপরিবারকে জায়গা দেওয়া যাবে।

পরের প্রত্যুষে তিনি সাগরমহারাজাকে গিয়ে বললেন, ভাই সাগর, আমার জায়গা তৈরী হয়ে গেছে। তুমি সপরিবারে সেখানে চলে এলো।

—দেখ ভাই, তোমার কোন কিছু অসুবিধা হবে নাতো?

সাগর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

— না-না আমাদের কোনই অসুবিধা হবে না আমাদের আগমনে। উঠোনটাকে বেশ বড় করে ফেলেছি।

—ভাই সূর্য, এখনও আমার পরিবারের সবাই কিন্তু এসে পৌঁছায়নি। ঠিক করে বলো, ওদের সবাইকে নিয়ে তোমার বাড়ী কি যাবো?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই যাবে।

এবার সাগরের জল আসতেই লাগলো। জলের আর শেষ নেই, অন্ত নেই। সূর্য্যঠাকুর বিপদে পড়ে গেলেন। তাঁর বাড়ী ডুবে গেল।

তিনি চাঁদবৌকে নিয়ে বাড়ীর বাড়ীর ছাদে উঠে গেলেন চারিপাশে বিরাট জলাশয়।

সাগর জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই সূর্য, আমার সবাই এখনও এসে পড়েনি। আসছে সবাই একের পর এক। তাদের আসতে বলবো কি?

—অবশ্যই অসাবে সবাই।

এবার সূর্যদেবের ছাদটাও ডুবে গেল জলে। তিনি একলাফে আকাশে উঠে গেলেন। চাঁদবৌও একলাফে দিয়ে আকাশে উঠে গেলেন সূর্য্য ঠাকুরের পিছুপিছু।

তখন দু'জনই উঠে গেছেন উর্দ্ধাকাশে। জলের সঙ্গে সঙ্গে কত মাছ,এসেছে, কত সাপ এসেছে! আর কত কুমীর! দলে দলে ছোট-বড় নানাজাতের কত কচ্ছপও এসেছে।

সূর্যঠাকুরের উঠোনে হাঁটু জল। ক্রমে সেই উঠোনে অনেক জল হলো। মানুষ গরু সব ডুবে যায়।

জল তবু আসছেই-আসছেই।

সাগর মহারাজ চেয়ে দেয়ে দেখছে সূর্যকে। মৃদু হাসছে তার দিকে চেয়ে।

বললে, তোমার বাড়ীঘর সব যে ডুবে গেল সুর্যভাই।

—তাতে কি হয়েছে? বন্ধুরা আসবে তাতে একটু অসুবিধা হবেই তো।

—এরপর তোমরা থাকবে কোথায়?

—আর একটু উপরে উঠবো।

—যদি আমার সব—আত্মীয়রা এসে যায় তখন কি করবে?

—আর একটু উপরে উঠে যাবো। আমার চাঁদবৌ ও যাবে।

—জল যদি আরো বেড়ে যায়?

—সপরিবারে আরো উপরে উঠবো।

—আমার আত্মীয় স্বজন যদি এখানে থেকে যায় চিরদিনের জন্য? তুমি তোমার চাঁদবৌকে এবং অন্যান্য আত্মিয়দের নিয়ে ফিরতে পারবে না যে?

—তাতে কোন অসুবিধা নেই। তোমার কেন অসুবিধা না হয়.তাই আমাকে দেখতে হবে। তোমরা সচ্ছন্দে বিচরণ করো যত্র তত্র। আমাদের তাতেই খুব আনন্দ হবে।

—ঠিক বলছো তো?

—হ্যাঁ এটাই আমার মর্মবাণী। আমি সব সময় থাকবো তোমার চেয়ে অনেক উপরে। এই কথাটা মনে রেখে দিও বন্ধু।

সাগর এই কথংয় একটু অসন্তুষ্ট হলো। বললে, তুমি কি তাহলে আর নিচে আসবে না?

—না—না—না।

—আমার সঙ্গে যে তোমার বন্ধুত্ব ছিল! আর কি হবে? সেটা থাকবে তো?

—অবশ্যই থাকবে সেই বন্ধুত্ব। তাতে কিছু অসুবিধা হবে না।

—তুমি খাবে কি?

—সামনে যাকে পাবো তাকে।

—তাহলে আমাদের খাবে?

—হয়তো সত্যি।

(ছোটবন্ধুরা, এটা একটা নিছক রূপকথা। সুর্য থেকে পৃথিবীটা অনেকটাই বড়। কাজে সুর্য কাছে থাকতেই পারে না। আর তার তাপও প্রচণ্ড। লেলিহান তার শিখা। পৃথিবী সুর্য্যর চারিপাশে ঘুরছে। পৃথিবী হলো একটা গ্রহ।

চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে। সমুদ্রের জল শোষণ করে সুর্য। এটাকে একটা গল্প হিসাবেই পড়বে। আফ্রিকার নাইজিরিয়ার এটা একটা উপকথামাত্র। এর মধ্যে কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে এসো

না। এটা শুধু কল্পনা মাত্র যাহাতে বাস্তবের একটু ছোঁয়া লেগেছে।)

সোনিয়া ও ডিসেম্বর

(রাশিয়া)

একটা ছোট মেয়ে সোনিয়া থাকতো রাশিয়ার এক গ্রামে। ছোটবেলায় মেয়েটি হারালো তার মাকে। তাই তার বাবা আবার বিয়ে করলেন।

নতুন বৌ এর নাম নাদিয়া। ছোট সোনিয়া। ছোট সোনিয়া তাদের কাছে থাকে। সৎমা মেয়েটিকে ভালবাসতো না। ফুট-ফুটে এই ছোট মেয়েকে দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করাত, কিন্তু পেট ভরে খেতে দিত না।

বৌটা সোনিয়াকে তাদের সঙ্গে থাকাটাও পছন্দ করতো না—তাই সোনিয়াকে একদিন ডেকে বললে সৎমা, সোনিয়া, আমাদের বাড়িতে একটা নিমন্ত্রণ রয়েছে। ঘর সাজাবার ফুল চাই। তুমি বনে গিয়ে কিছু ফুল তুলে আনো।

সোনিয়া বিস্মিত হলো। বললে, এটাতো ডিসেম্বর মাস। এখন ফুল কোথায় পাবো?

রাশিয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা দেশ। নভেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সেখানে শীতের প্রচণ্ড দাপট। এই সময় কোন ফুল পাওয়া যায় না, ফুল শুকিয়ে যায় অত্যন্ত শীতে।

ঝরে যায় গাছের শুকনো পাতা। দারুণ ঠাণ্ডায় কোন জলও পাওয়া যায় না। মার্চের থেকে সূর্যের তেজ আবার বাড়তে থাকে। গাছগুলো ফুল-ফলে ভরে যায়।

সোনিয়ার কথা শুনে নাদীয়া ঠাট্টার হাসি হাসে। বললে, আমি ফুল চাই। বনে যাও ফুল আনতে। ফুল আনতে না

পারলে এই বাড়িতে আর আসবে না। আমি বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দেবো। ফুল না পেলে বনেই থাকবে। নেকড়ে বাঘ তোমায় খেয়ে ফেলবে। এমন আলসে মেয়ের বেঁচে কি লাভ?

খুব দুঃখ হলো সোনিয়ার। নতুন মা তাকে বললো আলসে! সে কত কাজ করে সারাদিন। মেয়েটার খুব ভয়ও হলো।

কাঁদ-কাঁদ স্বরে সে বললে, এই ডিসেম্বর মাসে আমি জোগাড় করতে পারবো না ফুল। না আনতে পারলে বাড়ীর দরজাও বন্ধ আমার কাছে। মনের ভেতর ভয় হয় আমি ঠাণ্ডায় মরে যাবো, নইলে নেকড়ে আমায় খাবে।

বাইরে আসতেই সৎমা দরজা বন্ধ করে দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোনিয়া বনের দিকে পা বাড়ালো। ফুল খুঁজে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। বনের ভিতর অন্ধকার। ক্রমশঃ ভীষণ ঠাণ্ডায় আর ভয়ে সোনিয়া কাঁপতে লাগলো।

সহসা দূরে আগুন দেখতে পেল। সেদিকে ছুটল সোনিয়া। গিয়ে দেখলো, আগুন জ্বেলে ক'জন লোক চার পাশে বসে রয়েছে। তারা সংখ্যায় বারো।

—আমার বড্ড শীত করছে! সোনিয়া বললে। —আমি কি একটু আগুন পোহাতে পারি?

রাজবেশে একজন বুড়ো বললে সোনিয়াকে, কে তুমি বলোতো?

সোনিয়া এবার সবকথা বললে তাদের কাছে। এই শীতের দিনে কোথায় সে ফুল পাবে।

সবশুনে বুড়োটার মনে দুঃখ হলো সে নিজের ঠাণ্ডা হাত সোনিয়ার মাথায় বুলিয়ে দিল। বললে, তুমি ভালো মেয়ে। শোন দুঃখ করো না। কোন ভয় নেই। আমি রাজা ডিসেম্বর। এই এগারো জন হলো এগারো মাস। আমাদের সাহায্য তুমি পাবে।

অল্পবয়সী হাসিখুশী একটি লোকের মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তাকে ডেকে বুড়ো বললে, ভাই মার্চ, তুমি আমার এই আসনে একটু

বেসো তো।

মার্চ ডিসেম্বরের আসনে উঠে এলো। আশ্চর্য কাণ্ড! সোনিয়ার ঠাণ্ডায় অবশ শরীর গরম হলো ধীরে ধীরে। সোনিয়া চেয়ে দেখলো চারিদিকে গাছপালাগুলো সবুজ পাতায় ছেয়ে গেছে।

তাছাড়া সোনিয়ার পায়ের কাছে নানা রঙের ফুল এবং বহু প্রজাপতি। মেয়েটা খুব খুশী হলো।

আবার একদিন সৎমা মার্চ বললে, কিছু ভাল ফল নিয়ে এসো তো। আমার দরকার। তাড়াতাড়ি ফল আনতে বনে যাও। যদি তা না পারো খালি হাতে ফিরে এনো না যেন। না আনলে এ বাড়ীর দরজা চিরকালের জন্য তোমার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে।

ঘরেতে মনে মনে সোনিয়ার মা ভাবলো, এই কঠিন শীতে সোনিয়া কিছুতেই ফল খুঁজে পাবে না। বরফের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে ধীরে ধীরে সোনিয়া জমে যাবে। আর নেকড়েরা বড় দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাবে। সে বাড়ী ফিরবে না আর। আর এই ভেবে নাদিয়া খুব খুশী হলো।

সোনিয়ার না গিয়ে উপায় কি? তাহলে চিরকাল ঘরের বাইরে থাকতে হবে। সোনিয়া দৌড়ে বনের ভেতর গেল। বনের ভেতর যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি অন্ধকার। সে ভাবলে, সেইসব মাস কোথায়? তাদের দেখতে পেলে ভালো হতো!

ব্যাস! অমনি তাদের দেখা পেলো সে তারা সবাই আগুনের পাশে বসে আছে। তাদের বললে, আমার আগুন পোহাতে দাও দয়া করে।

রাজা ডিসেম্বর এবার ডাকলো এক তরুণ যুবককে। তার মুখ হাসিতে ভরা, নীল চোখে খুশী ভরা। তাঁকে বললে, তুমি আমার আসনে এতে বসো। সে হলো জুন মাস।

জুন মাস ডিসেম্বরের আসনে বসলো। অমনি শরীর গরম হলো সোনিয়ার। সে চেয়ে দেখে চারিদিকে ফুল আর ফলে ভরে

গেছে। গাছের ডালে বহুরকম পাখী আনন্দে গান গাইছে। সে বিস্মিত হলো।

জুন বললে সোনিয়াকে, নাদিয়ার জন্য যতখুশী ফুল আর ফল নিয়ে যাও।

সোনিয়ার ফুল ও ফল নেওয়া হলো জুন নিজের আসনে ফিরে এলো। ডিসেম্বর নিজের আসনে গিয়ে বলো। আগের মত আবার ঠাণ্ডা বইলো।

এবার সোনিয়া ফুল ও ফলরাশি নিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলো। ফুল আর ফলগুলো পেয়ে নাদিয়া খুশী হলো না। আরো রেগে গেল সে। মরে যায়নি সোনিয়া! বললে, বল এই ফুল ফল কোথায় পেলি?

সোনিয়া কোন জবাব দিল না প্রচণ্ড দুঃখে। পরদিন সকালে নাদিয়া বনের পথে চললো। ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় নাদিয়ার হাড়-গুলো কাঁপছিল। তবু সে চললো। যখন সোনিয়া ফল-ফুল পেয়েছে তখন সেও পাবে।

চারিদিকে চেয়ে চেয়ে অনেক পথ হেঁটে নাদিয়া কোন ফুল ফল পেলো না। সাদা বরফগুলো গাছপালা, পথ ছেয়ে আছে। তখনি সে দেখতে পেলে বারোজন লোক আগুনের পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছে।

রাজা ডিসেম্বর তাকে ডেকে বললে, তুমি কিছু কি খুঁজছ মা?

তা শুনে সোনিয়া বললে, বুড়োর দল পথ ছাড়। রাজা ডিসেম্বর নাদিয়ার মাথায় হাত রাখলো। অমনি তার দেহের ভেতর বরফের ঢেউ খেলে গেল। সে পড়ে গেল মাটিতে, তার শরীরটা ঠাণ্ডা হলো, ক্রমে বরফ হয়ে গেল। সে মরে গেল।

এরপর নাদিয়াকে ঘরে ফিরতে দেখলো না সোনিয়া আর তার বাবা। তারা দু'জনে খুঁজতে বের হলো বনের ভেতর।

তন্ন তন্ন করে খুঁজলো বনের ভেতর সব দিকে। কোথাও খুঁজে

বলেছিল। মাফেট ফুলবাগানে এসে বসতো একটা পাথরের উপর। এটা ছিল একটা টাফেট।

এরপর একদিন খুব গরম পড়েছে। পরী রানী মিস মাফেটকে ডেকে বললে, আমায় ভুলো না। আমার প্রিয় ফুলগাছগুলোতে জল দিতে ভুলে যেয়ো না। জল না পেলে গাছগুলো শুকিয়ে যাবে। তোমার ভীষণ ভুলো মন।

মিস মাফেট জল দিতে ভুলে গেল। দারুণ গ্রীষ্মে গাছগুলো জল পেলো না। ফুলগুলো সব শুকিয়ে গেল।

ফুলগুলোর দশা দেখে পরীরানীর খুব দুঃখ হলো। সে ছোট্ট মাফেটের কাছে একটা মাকড়সা পাঠালো। যাবার আগে মাকড়সাকে সে বললে, মাফেটকে গিয়ে বলো যে, সে গাছে জল দিতে ভুলে গেছে। এমন ভুল যেন আর না হয়।

মাকড়সা জানে না যে, মিস মাফেটকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাই সে বাতাসকে জিজ্ঞাসা করলে, মিস মাফেট কোথায় আছে? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?

বাতাস বললে, খুব পারি মাকড়সা ভাই, সেই ছোট্ট মাফেট এখন তার প্রিয় 'টাফেট' অর্থাৎ পাথরের বেঞ্চে বসে দই আর ঘোল খাচ্ছে।

ছুটে গেল মাকড়সা মাফেটের কাছে। সেও তার পাশে টাফেটের উপর বসলো।

এত বড় মাকড়সাকে দেখে মিস মাফেট ভয় পেয়ে তার আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এখনি বুঝি সে ছুটে পালাবে।

মাকড়সা বললে, ছুটে পালিও না, মিস মাফেট। তোমার কোন ভয় নেই। পরীরানী পাঠিয়েছেন আমাকে তোমার কাছে। তিনি বলেছেন, মাফেটকে গিয়ে বলো যে, সে যে আজকে ফুলগাছে জল দিতে ভুলে গেছে। এমন ভুল যেন আর না হয়।

—হ্যাঁ, আমি ফুলগাছে জল দিতে ভুলে গেছি। পরীরানী

পেল না নাদিয়াকে। কোথায়ও তার চিহ্ন নাই।

সোনিয়া এবার তার বারোজন বন্ধুকে খুঁজতে চেষ্টা করলো।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে সেই বারোজন বন্ধুর দেখা পেলো না। কোথায় তারা কে বলবে?

সোনিয়া বিস্মিত হলো। একি এক রহস্য! নাকি সবই মায়াজাল!

সোনিয়া তাদের যেখানে দেখেছিল সেখানে গিয়েও খুঁজলো। না, নেই সেই বারোজন।

কিন্তু সোনিয়া তাদের কথা কোনদিন ভুলতে পারবে না। তারা যে তাকে বিপদের রাতে সাহায্য করেছিল।

প্রতি বছর মার্চ মাসে গাছের ডালে ডালে সবুজ পাতা গজায় এবং ফলে-ফুলে ভরে উঠে, বনভূমি নতুন সাজে সেজে ওঠে, তখন জানালা খুলে সোনিয়া বাইরে চেয়ে থাকে।

সোনিয়া আনন্দে তাদের কথা স্মরণ করে। তার সঙ্গে সুপ্রভাত জানায় মার্চ ভাইকে।

যদিও ডিসেম্বর বুড়োই তাকে দয়া করেছিল। তার নির্দেশে অন্যান্তরা কাজ করেছিল। সেই বুড়োটাই ছিল প্রধান এবং একান্ত দয়ালু।

সোনিয়া কেবল ভাবে তাদের কথা। তারা কোথায় চলে গেল?

নাদিয়া না থাকায় সোনিয়া নিরাপদ হয়ে গেছে বেশ। হয়তো সে বিপদে পড়ে গেছে!

খুশীতে সোনিয়া ডিসেম্বর গোষ্ঠীকে বলে, তোমরা যে রাশিয়ায় এসেছো, সেজন্য তোমার আমার ভালবাসা নিও।

মিস মাফেট

(ইংলণ্ড)

মিস মাফেট ছিল একটা ছোট পরী। পরীদের রানী তাকে খুব ভালবাসতো। সে মাফেটকে তার বাগানে বসবার কথা

আমার উপর এবার খুব রেগে যাবে।

ছোট্ট মাফেট এবার ফুলগাছে জল দিতে ছুটলো। মাকড়সা তখন মিস মাফেটের দই ও ঘোলের বাকীটুকু খেয়ে নিল। ঠিক-মত মাফেট কাজ করেনি, তাই তার খাওয়া হল না। কিন্তু পরী-রানী জানে এই মাফেট ভীষণ ভীষণ ভুল করে।

পৃথিবীর পিতা

পুরাণের গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

সকলের আগে যাহাকে লোকে রাজা বলিয়াছিল, তাঁহার নাম ছিল পৃথু। তিনি সূর্যবংশের লোক ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল বেন। 'রাজা' কি না যে 'রঞ্জন' করে অর্থাৎ খুশি রাখে। পৃথু নানা রকমে প্রজাদিগকে খুশি করিয়াছিলেন, তাই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'রাজা, নাম দিয়াছিল। পৃথুর পূর্বে লোকের দিন বড়ই কষ্টে যাইত। সেকালে গ্রাম নগর পথঘাট কিছুই ছিল না, ঝোপে জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় সকলে বাস করিত। পৃথু তাহাদিগকে বাড়ি ঘর বাঁধিয়া একজায়গায় থাকিতে শিখাল। আর পথ বানাইয়া চলা-ফেরার সুবিধা করিয়া দেন। সেই হইতে বস্তির সৃষ্টি হইল। সে-কালের লোকে চাষবাস করিতে জানিত না। ফলমূল খাইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইত। জমিতে কাঁকর, আকাশে মেঘ নাই; খট্‌খটে শুকনো মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া আছে, তাহাতে শস্য জন্মাইতে গেলেও তাহা হয় না। প্রজারা পৃথুকে বলিল' "হে রাজা, পৃথিবী সকল শস্য খাইয়া বসিয়াছে, আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব? ক্ষুধায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি আমাদিগকে শস্য আনিয়া দাও।"

পৃথু বলিলেন, "বটে, পৃথিবীর এমন কাজ? শস্য সব খাইয়া বসিয়াছে? আচ্ছা এখনি ইহার সাজা দিতেছি। আন তো রে ধনুক, নিয়ে আয় তো তীর।"

পৃথিবী ভাবিল, 'মাগো, মারিয়াই ফেলে বুঝি।' সে প্রাণের ভয়ে গাই সাজিয়া লেজ উঁচু করিয়া ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। কিন্তু পৃথুর বড়ই রাগ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। আকাশ পাতাল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, ব্রহ্মলোক অবধি ছুটিয়া গেল; কিছুতেই সে তাঁহাকে এড়াইতে পারিল না। তখন পৃথিবী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দোহাই মহারাজ! আমি স্ত্রীলোক, আমাকে মারিলে আপনার পাপ হইবে।"

পৃথু বলিলেন, "তুমি ভারি দুষ্ট। তোমাকে মরিলে অনেক উপকার হইবে। কাজেই ইহাতে পাপ নাই বরং পূণ্য আছে।"

পৃথিবী বলিল, "প্রজাদের যে উপকার হইবে বলিতেছেন, আমি মরিলে তাহারা থাকিবে কোথায়?"

পৃথু বলিলেন, "কেন? আমি তপস্যা করিয়া তাহাদের থাকিবার জায়গা করিব।"

পৃথিবী বলিল, "আমাকে মারিলে শস্য পাওয়া যাইবে না; শস্য পাইবার উপায় আমি বলিতেছি। সে আর এখন শস্য নাই, আমার পেটে হজম হইয়া দুধ হইয়া গিয়াছে। আমাকে দোহাইলে সেই দুধ পাইতে পারেন। কিন্তু একটি বাছুর চাই, নহিলে দুধ বাহির হইবে না। আর জমির উঁচু নিচু দূর করিয়া দিন, যেন দুধ দাঁড়াইতে পারে, গড়াইয়া না চলিয়া যার।"

রাজা তখনই ধনুকের আগা দিয়া জমির উপরকার ঢিপি সরাইয়া দিলেন। তাহাতে জমি সমান হইল, আর ঢিপি সকল এক এক জায়গায় জড় হইয়া পর্বতের সৃষ্টি হইল। সমান জমির উপরে লোক ঘর-বাড়ি বাঁধিল। সেই হইতেই গ্রাম নগরের সৃষ্টি। তাহার আগে এ-সব ছিল না। জমি সমান হইল, এমন একটি বাছুর হইলেই গাই

দোহাইয়া সেই জমির উপরে দুধ ছড়ান যাইতে পারে। সেই বাছুর হইলেন স্বয়ম্ভুব মনু। এমন বাছুর তো আর সহজে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখিয়াই গাইয়ের বাঁট দিয়া দুধ ঝরিতে লাগিল। তখন পৃথু নিজ হাতে গাই দোহাইতে লাগিলেন। সে আশ্চর্য গাই না জানি কতই দুধ দিয়াছিল। সংসারে যত শস্য সকলই তাহাকে দোহাইয়া পাওয়া গেল, সেই শস্য খাইয়া এখনো আমরা বাঁচিয়া আছি। শুধু তাহাই নহে, পৃথুর পরে দেব, দানা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে আসিয়া সেই গাই দোহাইতে লাগিল। সকলেই নিজের নিজের বাসন আনিল। নিজেদের এক একটি বাছুর ঠিক করিয়া আনিল, দোহাইবার লোক অবধি আনিতে ভুলিল। পাথরের বাটিতে, কেহ লাউয়ের খোলায়, কেহ পদ্মপাতায় এমনি করিয়া তাহারা কতরকমের জিনিসে যে দোহাইয়া নিল, তাহা বলিয়া শেষে করা যায় না। তথাপি দুধে কম পড়ে নাই। পৃথিবীও বাঁচিয়া গেল। এত জিনিস যাহার কাছে পাওয়া যায়, তাহাকে কি বুদ্ধিমান লোকে মারে? কাজেই পৃথু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। পৃথু তাহাকে প্রাণদান করিয়াছিলেন, তাই আজও পৃথিবী বাঁচিয়া আছে। সার, প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথু পৃথিবীর পিতার তুল্য হইলেন। সেই জন্যই পৃথিবীকে পৃথুর কন্যা বলা হয়, আর তাহার নাম হইয়াছে 'পৃথিবী, বা 'পৃথ্বী।'

যাহা হউক, পৃথিবীর নামের অন্যরূপে অর্থও দেখা যায়। পৃথ্বী বলিতে খুব বড়ও বুঝায়। পৃথিবী যে খুবই বড় তাহাও তো আমরা দেখিতেই পাইতেছি। সুতরাং পৃথিবী নাম যথার্থই হইয়াছে।

পারসিয়ুস ও অ্যাণ্ড্রোমিডা

[গ্রীস]

আফ্রিকার একটি দেশ হলো ইথিওপিয়া। এদেশের রাজা ও রানীর নাম ছিল কেফিয়ুস ও ক্যাসিওপিয়া। রানী ক্যাসিওপিয়া ছিলেন অদ্ভুত সুন্দরী।

একদিন তিনি বোকার মত বলে বসলেন, আমি সাগর-নেরিডদের চেয়েও বেশী সুন্দরী।

একথা শুনতে পেয়ে সাগর দেবতারা বেশ রেগে গেলেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে, অহঙ্কারী ক্যাসিওপিয়াকে শাস্তি দিতে হবে।

সমুদ্র দেবতাদের রাজা পসিডন এক ভীষণ দর্শন সাগর-ড্রাগনকে পাঠালেন ইথিওপিয়ায়।

এই ড্রাগন রোজ হানা দিতে লাগালো ইথিওপিয়ার উপকুলে। তার ভীষণ অত্যাচারে দেশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে গেল। দুঃখে আর আতঙ্কে ছেয়ে গেল তাদের মন।

কে বলবে কবে কোনদিন তার হাতে একবার পড়লে রক্ষা থাকবে কিনা। নিশ্চয়ই ড্রাগন যাকে পাবে তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। ছেড়ে দেবে না।

একদিন এক বিজ্ঞ বুড়ো এলেন কেফিয়ুসের রাজসভায়।—রাজাকে তিনি বললেন, মহারাজ, শুধু একটা কাজের বিনিময়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা পেতে পারে।

—বলো কি কাজ করতে হবে? রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—তাতে যদি রক্ষা পাওয়া যায়।

বুড়ো মানুষটা চুপ করে রইলেন।

—বলুন কি কাজ করতে হবে? করা যাবে তাই প্রয়োজন হলে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন আবার।

—কিন্তু সেকাজে কি আপনি রাজী হবেন?

—রাজি আছি। আমার প্রজাদের রক্ষা করতে আমি যে কোন পথ নিতে পারি।

—বেশ। মহারাজা, আপনার একটি সুন্দরী মেয়ে আছে জানি।

—হ্যাঁ, আছে।

—ঐ সুন্দরী মেয়েকে যদি সাগর-ড্রাগনের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে সেই নিষ্ঠুর ড্রাগন এই উপকুল ছেড়ে চলে যাবে আশা করি। এই ইথিওপিয়ার মানুষও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।

প্রথমে রানী ক্যাসিওপিয়া কিছুতেই এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। কিন্তু প্রজারা বার-বার বলতে লাগলো, রানীমা আপনি অস্বীকার করবেন না। তা না হলে আমরা সবাই বিপদে পড়বো।

অবশেষে প্রজাদের অনুরোধে সায় দিতে হলো রাজা ও রানীকে। তার ফলে হতভাগিনী এ্যাণ্ড্রোমিডা হলো মৃত্যুপথ যাত্রী।

তাই রাজকন্যা এ্যাণ্ড্রোমিডাকে সবার অনুরোধে নিয়ে যাওয়া হলো সমুদ্র ইথিওপিয়ার উপকুলে। একটা লোহার শিকল দিয়ে এ্যাণ্ড্রো-মিডাকে বেঁধে রাখা হলো কুলের একখণ্ড বড় পাথরের সঙ্গে।

রাজা-রানী এবং অন্যান্য প্রজারা সেখান থেকে একটা নিরাপদ জায়গায় সরে গেলেন। তারা লক্ষ্য করতে লাগলেন সাগর-ড্রাগন আসে কিনা।

হতভাগিনী এ্যাণ্ড্রোমিডা একেবারে একাকিনী। সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো।

সৌভাগ্যবশতঃ তখন মহাবীর পারসিয়ুস উড়ে চলেছিলেন ইথিও-পিয়া দেশের উপর দিয়ে। তার পায়ে ছিল 'হারমিস' এর পাখাওয়ালা একজোড়া জুতো।

তাই তাঁর উড়তে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। বেশ উড়ে চলছিলেন। রাজকন্যা এ্যাণ্ড্রোমিডাকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল, উড়তে উড়তে সেখানে এলেন পারসিয়ুস। রাজকুমারী খুব কাঁদছিল একনাগাড়ে।

সেই কান্না শুনে উপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন পারসিয়ুস। এসে দাঁড়ালেন পাশে।

কি হয়েছে তোমার? মোলায়েম স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন রাজকন্যাকে।

করুণ কান্না ভেজা গলায় তাকে একে সব বললে সেই রাজকন্যা। তার বলা শেষ না হতেই একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা গেল। সেই মুহূর্তে সাগরের জল ডথাল-পাথাল হয়ে উঠলো।

—ঐ আসছে! সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনটা আসছে বুঝি গ্রাস করতে! কে আছো! বাঁচাও! আমায় বাঁচাও!

চীৎকার করে উঠলো রাজকন্যা। ভয়ে সে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে থাকল।

সাগর-ড্রাগনটা জলের ভেতর থেকে উঠে এলো। সর্বাঙ্গ অজগর সাপের মত, আর সারা গা আঁশে ভরা।

ড্রাগনটার মুখে দু'পাটি দাঁত। লাল বড় জিভ লক্-লক্ করছে। আর তার নিঃশ্বাসের বেরিয়ে আসছে আগুনের হলকা।

রাজকন্যা এ্যাণ্ড্রোমিডার মনে হোল, এই ভীষণ দর্শন ড্রাগনকে কেউ মেরে ফেলতে পারবে না। আকাশ থেকে যে যোদ্ধাটি এসে দাঁড়িয়েছে তারপাশে, সেও পারবে না এই বিভীৎস ড্রাগনটাকে মারতে!

সহসা সব কিছু শান্ত হয়ে এলো। শান্ত হলো সাগরের জল।

থেমে গেল সেই ড্রাগনের ভীষণ চেহারা আর গর্জন। তরুণ যোদ্ধা পারসিয়ুসের কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল—রাজকন্যা, কোন ভয় নেই। ড্রাগনটা আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোমার।

সাগরের দিকে তাকালো এ্যাণ্ড্রোমিডা। বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো, বিরাট সেই সাগর-ড্রাগনটা পাথর হয়ে গেছে, একটুও নড়ছে না।

কারণ ভয়ঙ্করী মেডুসা দানবীকে মেরে তার কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে পারসিয়ুস ফিরে আসছিলেন আকাশ পথে।

সহসা রাজকন্যার বিপদ দেখে নেমে এসে পাশে দাঁড়ালেন। মেডুসার দানবীর কাটা মুণ্ডু দেখাতেই ড্রাগনটা পাথরে পরিণত হয়ে গেল।

ইথিওপিয়ার মানুষের তাই দেখে প্রশংসা করতে লাগলো পারসিয়ুসকে।

ইকোরাস

(গ্রীস)

গ্রীস দেশে দিদালুস নামে একজন লোক ছিল। তার একটা ছেলে আর এক ভাইপো ছিল। ইকোরাস তার ছেলের নাম। ভাইপোর নাম ছিল তালুস।

দিদালুস হাতের কাজে খুব সুদক্ষ। কাঠ, পাথর এবং নানা রকমের ধাতু থেকে অদ্ভুত সব জিনিস তৈরী করতে পারতো সে।

সে বুদ্ধির দ্বারা অনেক নতুন নতুন জিনিস আবিস্কার করেছিল। এতে কাঠুরিয়াদের খুব উপকার হয়েছিল। সেই বিদ্যা সে শিখিয়েছিল ছেলে আর তার ভাইপোকে।

ভাইপো তালুস এত চালাক ছিল যে, অল্প কিছুদিনের ভেতর সে কাকার চেয়েও ভাল ভাল জিনিস তৈরী করতে শিখেছিল।

তাই দিদলুসের হিংসা হলো তার ঐ ভাইপোর ওপর। একদিন রেগে সে তালুসকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

ফলে তালুস মাটিতে পড়ে মরে গেল। ভয় পেয়ে দিদালুস ইকোরাসকে নিয়ে গ্রীসে পালিয়ে গেল। দু'জনে এলো ক্রীট দ্বীপে।

ক্রমে ক্রীট দ্বীপের রাজা দিদালুস আর তার ছেলেকে স্বাগত জানালেন। কারণ, দিদালুস একজন দক্ষ হস্তশিল্প কারিগর।

তাকে রাজা অনেক কাজ দিলেন। একের পর এক কাজ ক'রে যেতে লাগলো দিদালুস। এসব কাজ ছাড়াও দিদালুস একটা বিরাট পাথরের কারাগার তৈরী করলো।

এই কারাগারে এতপথ তৈরী করলো সে, যে কেউ কারগারে একবার ঢুকলে আর বেরোবার পথ পেতো না বিরাট গোলোক ধাঁধাঁর পথ চিনে।

এই কারাগার প্রথম তৈরী করা হয় মিনোট্যার নামে এক ভয়ঙ্কর জীবকে আটকে রাখতে।

এই ভয়ঙ্কর জীবকে বন্দী করেছিলেন ক্রীটের রাজা। এই জীবটার দেহ মানুষের মত হলেও মাথাটা ছিল বড় একটা ষাঁড়ের মত।

এই ষাঁড়ের মাথায় ছিল ভয়ঙ্কর দুটি শিং। মহাবীর থেসিয়ন এই ভয়ঙ্কর প্রানীটাকে হত্যা করেছিলেন পরিশেষে।

দিদালুস ছেলে ইকোরাসকে নিয়ে মহাসুখে ক্রীট দ্বীপে রইলেন। কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা রইলো না। বিপদ ঘটলো একদিন।

রাজার সঙ্গে দিদালুসের বিবাদ বাধলো। রাজা রেগে গিয়ে দিদালুস আর তার ছেলেকে আটকে রেখেদিলেন সেই বিরাট কারাগারে।

দিদালুস নিজেই অসংখ্য পথওয়ালা এই কারাগার বানিয়েছিল, তবু তাকেও এখান থেকে বের হবার পথ খুঁজতে লাগলো। পেলো না জন্য খুঁজে পথ।

কিছুদিন কারাগারে বন্দী থাকার পর বাবা এবং ছেলে দু জনের কাছেই এই বন্দীজীবন অসহ্য হয়ে উঠলো।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে দিদালুস পালাবার একটা কৌশল আবিস্কার করলো। একরাশ পাখীর পালক দিয়ে ারটে বড় ডানা বানালো।

দুটো ডানা নিজের দু'কাঁধে আটকে দিলে মোম দিয়ে। তেমনি— করে ছেলের দু কাঁটেও দুটো ডানা আটকে দিলে মোম দিয়ে।

এরপর সুযোগ বুঝে বাবা ছেলেকে নিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল সেই কারাগার থেকে। যেতে যেতে ছেলেকে সে বললে,—সাবধান উড়তে উড়তে আকাশের খুব উঁচুতে উঠবেনা। তাহলে মোম গলে যাবে এবং ডানা খসে যাবে। তখন মাটিতে পড়ে প্রাণ হারাবে।

কিন্তু পালাবার আনন্দে ছেলে বাবার সাবধান বানী ভুলে গেল। তাই উড়তে উড়তে সে আকাশের অনেক উঁচুতে গেল।

উড়তে উড়তে ছেলেটা চলে গেল সুর্যের প্রায় কাছাকাছি। তার আনন্দ আর ধরে না। তারা মুক্তি পেয়েছে! তারপর বাবার সাহায্যে সুন্দর দুটো ডানাও পেয়েছে!

তাই আজ মনের আনন্দে পাখির মত নীল আকাশের বুকে বেড়াতে পারছে।

আনন্দে অধীর হয়ে গেল ইকোরাস, উড়তে উড়তে বাবার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। বাবার দিকে তার দৃষ্টি নেই।

তারপর ঘটলো বিপদ। ডানার মোম গলে গেল। ফলে তার ডানা দুটো খসে পড়লো।

একটা ভারী পাথরের মত পুত্র ইকোরাস উঁচু আকাশ থেকে সশব্দে পড়ে গেল সমুদ্রের ভেতর। তারপর ইকোরাস ডুবে গেল সেই ভীষণ সমুদ্রের গভীরে।

এদিকে যখন দিদালুস আকাশের দিকে লক্ষ্য করলো, তখন সে তার ছেলেকে দেখতে পেলো না।

শুধু নিচে লক্ষ্য করলো প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাথায় ইকোরাস দোদুল্যমান ক্রমে জল জলদেশে সে নিরজ্জিত হলো।

আর তার পালকদুটো কিছু পরে সমুদ্রে পড়লো এবং ভেসে চললো।

তাই দেখে দিদালুস কপাল চাপড়াতে থাকলে।

তার ভাইপোকে সে ছুঁড়ে দিয়েছিল জানালা পথে নিচে। ফলে সে মারা গিয়েছিল। আজ তার ছেলেকে ঈশ্বর ছুঁড়ে দিলেন নিচে সমুদ্রের অতল গহ্বরে। এইভাবেই যেন একটা বিরাট প্রতিশোধ নিলেন কোন এক অদৃশ্যলোকের ন্যায় বিচারক।

পিরেমাস ও থিসবী

(ব্যাবিলন)

বহুদিন আগে কথা। ব্যাবিলন শহরে কোন জায়গায় থাকতো দু-ভাই বোন। তারা একে অপরকে ভালবাসতো। ছেলেটার নাম পিরেমাস এবং মেয়েটার নাম থিসবী।

তারা দু'জন পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতো। এই বাড়ির মাঝখানে ছিল একটা বাগানের প্রাচীর। অবশ্য পাশাপাশি হলেও দুটি বাড়ির ভেতরে সম্পর্ক ভালো ছিল না।

পিরেমাস ও থিসবীর মা-বাবার মধ্যে ছিল বিবাদ। এরজন্য এরা একে অন্যের সঙ্গে দেখা করতো না। তাদের অভিভাবকরাই দেখা করতে দিত না।

তাই থিসবী আর পিরেমাসের মনে কোন সুখ নেই। এরপর এক-দিন পিরেমাস দুটি বাড়ির মাঝখানের প্রাচীরে একটা ছোট ফুটো আবিষ্কার করে ফেললে। এতে তাদের বিশেষ সুবিধে হলো। তারা দু'ই ভাই-বোনে কথাবার্তা বলতে পারতো। কথাবার্তার মাঝে ঠিক করলো দু'জন তারা রাতে নগরের ফটকের বাইরে একটা গাছের নিচে যাবে। সেখানে তারা প্রাণখুলে গল্প করবে।

গাছটা ছিল তুঁতে গাছ। ফলগুলো নরম এবং সাদা। তার নিচে ভাইবোন পিরেমাস ও থিসবী বেশ দেখা-সাক্ষাৎ করছিল।

দু'জনেই ভারী খুশী হচ্ছিল এই সাক্ষ্যাতে। ভাইবোন প্রাণভরে গল্প করে আর হাসে।

এরপর একদিন সন্ধ্যার পর অর্থাৎ ঠিক সময়ের আগেই থিসবী তুঁতে গাছটার নিচে পৌঁছে গেল এবং পিরেমাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

সহসা একটা ভীষণাকার সিংহ কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে গেল সেখানে। সিংহটা সবেমাত্র ছাগল খেয়ে এসেছে নিশ্চয়। তার মুখের রক্তরাঙা ছোপ দেখে তাই মনে হয়।

থিসবী তার ঐ ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল ভীষণ ভয় পেয়ে। কাছে একটা পাহাড় ছিল। থিসবী প্রাণভয়ে পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা দেখে তার ভেতর ঢুকে গেল।

ছুটবার সময় তার সুন্দর ওড়নাটা খুলে পড়ে গেল পথের মাঝখানে। সিংহটা শেষে ওড়নাটার উপর ভুল করে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সিংহের মুখের রক্তে রাঙা হয়ে গেল ওড়নাটা। রেগে সিংহ ওড়নাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

সেটা যে খাবার জিনিষ নয়, তাই তার এত রাগ হলো ওটার উপর।

কিছুক্ষণ সেখানে থেকে ভীষণ গর্জন করে সিংহটি ছুটে গেল বনের দিকে।

ঠিক তার একটু পরেই পিরেমাস এসে গেল তুঁতে গাছটার নিচে। আসতে তার একটু দেরী হয়ে গেছে সেদিন।

বোন থিসবীকে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি সে আসেনি!

না-না, তা হতে পারেনা। সে এসেছে নিশ্চয়ই। বোধহয় কোথাও সে লুকিয়ে আছে জব্দ করবার জন্য।

—থিসবী! থিসবী!—পিরেমাস ডাকলো বারংবার।

তার কোনই উত্তর এলো না। শেষে পিরেমাস ভাবলে, তার আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে, তাই থিসবী রাগ করে চলে গেছে।

সহসা তার দৃষ্টি পড়লো ওড়নাটার দিকে। সেটার ছেঁড়া টুকরোগুলো রক্তে লাল! কেন? কারণ কি? কি হয়েছে?

তাহলে থিসবী ঠিক সময়ের এসেছিল। কোন বন্যজন্তু তাকে মেরে ফেলেছে! কি দুর্ভাগ্য!

দুঃখে কাতর হয়ে পড়লো সে। অতি দুঃখে চীৎকার করে উঠলো, এ আমারই দোষ। আমার জন্য এই অবস্থা হলো! আমিই তো থিসবীকে এখানে আসতে বলেছিলাম। আমার জন্য প্রাণটা হারালো। আমি যদি আগে আসতাম তাহলে থিসবীকে বাঁচানো সম্ভব হতো। থিসবী আর নেই! প্রাণ হারিয়েছে! তবে আর আমার বেঁচে থাকার কি দরকার?

এবার খাপ থেকে তরবারি খুলে নিজের বুকে বসিয়ে দিলে পিরেমাস। তার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

অথচ থিসবী মারা যায়নি। একটু পরে সে গুহার ভেতরে থেকে তুঁতে গাছটার তলায় এলো।

এসেই সে দেখতে পেলো তুঁতে গাছটার তলায় পিরেমাসের মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

তার পাশে পড়ে আছে তরবারিখানা। আর পিরেমাসের হাতে ধরা আছে রক্তমাখা ওড়নার একটা টুকরো।

অমনি থিসবী বুঝতে পারলো সব ব্যাপারটা। পিরেমাস রক্তরাঙা ওড়নার টুকরো দেখে ভেবেছে কোন বন্যজন্তু তাকে মেরে ফেলেছে। তাই সে অতি দুঃখে আত্মহত্যা করেছে।

এরপর ভাইয়ের জন্য বোনও কাতর হলো। পিরেমাস আত্মহত্যা করেছে থিসবীর জন্য। যদি ঐ রক্তাক্ত ওড়নাখানা সে না দেখতো তাহলে আত্মহত্যা করতো না।

এবার পিরেমাসের তরবারি নিয়ে থিসবী ভাইয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

তার রক্তাক্ত দেহ দেখে কাতর হয়ে তার মধ্যে আত্মহত্যার অনুপ্রেরণা জাগলো। সে ঐ তরবারি নিয়ে আত্মহত্যা করলো।

তার রক্তাক্ত দেহখানা ভাইয়ের মৃতদেহের পাশে পড়ে রইলো।

সেই থেকে তুঁতে গাছের ফল নাকি সাদা থেকে লালে রূপান্তরিত হলো।

পিরেমাস আর থিসবীর রক্তে রাঙা হয়ে গেল তুঁতে গাছের ফল। আর সাদা হয়নি সে ফল।

কুৎসিত হাঁসের ছানা

(ডেনমার্ক)

একটা খামার বাড়ি ছিল। সেই খামারের গোলার একটি কোণে বসে একটা পাতিহাঁস কতকগুলো ডিম পেড়েছিল। প্রতিদিন হাঁসটা সেই ডিমে তা দিত।

একদিন ঐ ডিমগুলো ফুটে বেরিয়ে এলো কতকগুলো বাচ্চা। বাচ্চাগুলো কিং সুন্দর! না-না, সবগুলো সুন্দরী নয়, একটা বাচ্চা ছিল বেশ কুৎসিত।

সে যখন তার মায়ের কাছে গেল, তখন তার মা তাকে দেখে বললে, ছিঃ! ছিঃ! কি কুৎসিত চেহারা হয়েছে!

বাচ্চাটার অন্যান্য ভাইরা তার দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে তাকে পাগল করে তুললো।

কুৎসিত ভাইটা অন্যদের চেয়ে এত আলাদা যে অন্যান্য ভাইরা তাকে কিছু খেতেও দিত না। ভাইদের কাছে আসতেই তাকে ধমকে সরিয়ে দিত দূরে।

—সরে যা এখান থেকে! তোর মত বিশ্রী ভাই আমাদের ভেতর থাকতে পারবে না। তোর সঙ্গে আমরা খেলা করবোই না।

কেউ তাকে ভালবাসতো না।

হ্রদের জলে নিজের চেহারা দেখে কুৎসিত বাচ্চাটা বলতো, ছিঃ! সত্যিই আমি কি কুৎসিত!

ছানাটা কাঁদতে থাকে। তার মনে কত দুঃখ হয়! কত কষ্ট পায় সে নিজেকে কুৎসিত জেনে!

—সুন্দর নয় বলে কেউ আমায় ভালবাসবে না? সবাই আমাকে ঘৃণা করবে? সবাই আমাকে এড়িয়ে যাবে? আপন মনে সে এই কথা-গুলো বলতো আর নিরবে কাঁদতো।

বাচ্চাটার দুঃখ কেউ বুঝতে পারে না। ওর মা, ভাই, বোন কেউ বোঝে না।

তাই সে ঠিক করলো বাড়ি ছেড়ে বনে চলে যাবে। চললো ও ঠিক তাই বনের পথে একদিন।

বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে জায়গা খুঁজতে লাগলো, যেখানে সে লুকিয়ে থাকতে পারবে, কেউ তাকে দেখে নাক সিঁটকাতে পারবে না।

বনের ভেতর একটা খালি বাড়ি ছিল। সেখানে কেউ থাকতো না। বাচ্চাটা শীতকালটা সেই ঘরেই কাটিয়ে দিল।

ফাঁকা বাড়িটা।—এখানে আমি একলাই থাকবো। খুব ভাল হবে। কেউ আমায় দেখে আর হাসবে না। আপন মনে বলে সে।

এরপর শীতকালে গেল। ঝরাপাতা গাছে ফের কচিপাতা দেখা দিল। আবার ফুল ফুটলো, বসন্তকাল ফিরে এলো।

বাচ্চাটার মনেও খুশীর ছোঁয়া দেখা দিল। সেও আনন্দে বসন্তে বেড়াতে বের হলো।

ঘুরতে ঘুরতে এলো একটা হ্রদের ধারে। দেখলো একটা সুন্দরী মেয়ে হাঁস খেলা করছে হ্রদের জলে। তাকে দেখে খুব ভাল লাগলো। তার সঙ্গে খেলা করতে জলে নামলো।

হ্রদের নির্মল জলে তার ছায়া দেখলো।

আশ্চর্য ব্যাপার! সে তো আর কুৎসিত নেই! সুন্দর দেখতে লাগছে তাকে।

এবার হাঁসের ছানাটা বুঝতে পারলো কেন অন্যান্য ভাইবোনদের থেকে সে আলাদা ছিল।

আসলে ওরা নিজের ভাই বোন নয়। ওরা হলো অন্যজাতের। অর্থাৎ পাতিহাঁস। সে যে রাজহাঁস।

এরপর জলে ভাসমান সুন্দরী রাজহংসীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

মহাসুখে দিন কাটায় দু'জন। তারপর তাদের ছেলেমেয়ে হলো একে একে অনেকগুলো।

তাদের নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলো। হ্রদের জলে সবাই মিলে খেলা করে। এখন আর সে কুৎসিত নেই। সে যে তার পরিপূর্ণ রূপ পেয়ে গেছে।

———

ঘুমন্ত সুন্দরী

(ফরাসী রূপকথা)

বহুকাল আগে এক দেশে এক রাজা ও রাণী ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। অবশ্য শুধু একটি জিনিষের অভাবে তারা পুরোপুরি সুখী হাতে পারেননি। তাঁদের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না।

নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে একদিন রাণী ভাবছিলেন, যদি আমার একটি বাচ্চা থাকতো, তবে আর কিছু আমি চাইতাম না।

ঠিক তখনি একটা ব্যাঙ লাফ দিয়ে জলের ভেতর থেকে পাড়ে উঠে এলো। রাণীর দিকে তাকিয়ে ব্যাঙটা বললে, তোমার সাধ পূর্ব হবে। এক বছরের ভেতর তোমার মনের সাধ পূর্ণ হবে রাণী। তোমার একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে হবে, মনে রেখো।

রাণী তো মহাখুশী হলো ব্যাঙের কথা শুনে। তারপর সত্যিই এক বছরের ভেতর রাণীর একটি সুন্দর মেয়ে হলো। শিশুটাকে যে দেখলো সেই বললে, এমন সুশ্রী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি।

রাজা তো ভারী খুশী। তিনি স্থির করলেন, কন্যার নামকরণ উৎসবে একটা ভোজের ব্যবস্থা করবেন।

তাই নানা দেশের রাজা, রাণী, রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাদের কাছে রাজা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। রাজ্যের জ্ঞানী পরীদের নিমন্ত্রণ করতেও ভুললেন না। এখানে একটু অসুবিধা হলো, এই রাজ্যে তেরোজন জ্ঞানী পরী ছিল।

রাজার বাড়ীতে ছিল মাত্র বারোখানা সোনার থালা। একজনকে বাদ দিয়ে বারোজনকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন।

ভোজসভাটা সুন্দর হলো। সবাই ভাল ভাল পোযাক পরে এলো। ভাল খাবার বহুরকমের খেলো তারা।

পরীদের নিয়ম রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করে একটি বরদান করা। তাই প্রথম পরী বর দিল, রাজকন্যা হবে ক্রমে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী।

দ্বিতীয় জন বললে, রাজকন্যার স্বভাব হবে খুব চমৎকার। তৃতীয় পরী বললে, রাজকন্যার কণ্ঠস্বর হবে অতি মিষ্টি। নাইটিঙ্গেল পাখীর মত সে গান গাইতে পারবে। চতুর্থ পরী বললে, রাজকন্যা ভাল নাচতে পারবে।

এমনিভাবে, এগারো নম্বর পরী যখন রাজকন্যাকে বরদান করছিল, তখন সহসা তেরো নম্বর পরী সেখানে এলো। রাগে সে কাঁপছিল। কারণ রাজা তাকে নেমন্তন্ন করেনি।

তাই রেগে বাচ্চার কাছে গিয়ে আঙ্গুল নেড়ে বললে, এই রাজকন্যার বয়স যখন পনেরে বছর হবে তখন তার আঙ্গুলে স্থতো কাটা মাকুর খোঁচা লেগে মারা যাবে।

এই তেরো নম্বর পরীর অভিশাপের কথা শুনে সেই রাজা আর রাণী দুঃখে কাতর হলেন।

এবার বাচ্চার কছে এগিয়ে এলো বারো নম্বর পরী। বললে, আমি আমি অভিশাপ পাল্টে দিতে পারবো না। তবে একটু পরিবর্তন করে দিকে পারবো।

সে বললে, মাকুর খোঁচা যখন লাগবে তখন সে মারা যাবে না, গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই ঘুম থাকবে একশো বছর।

রাজার আদেশে তাই রাজ্যের সব মাকু ভেঙ্গে দেওয়া হলো। ফলে রাজ্যের লোক মাকুতে স্থতো কাটতে ভুলে গেল।

রাজার বিরাট প্রাসাদদুর্গে রাজকন্যা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে প্রাসাদের ভেতর একটা সরু পথ পেল রাজকুমারী।

আগে কখনো এইপথটা সে দেখেনি। পথের শেষে একটা অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের দিকে।

সিঁড়ি বেয়ে রাজকন্যা উপরে উঠতে লাগলো। এই পথটা কেউ ব্যাবহার করে না। তাই পরিস্কার হয় না।

রাশি রাশি মাকড়সার জাল, ঝুল আর জঞ্জাল জমে রয়েছে। যেতে যেতে মাকড়সার জাল মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিল।

সিঁড়ির মুখে একটা দরজা ছিল। সেটা কৌতুহলী হয়ে রাজকন্যা দিল খুলে। তার ভিতরে একটি ঘর। একটা বুড়ী সেখানে বসে সুতো কাটছে।

আগে কখনো রাজকন্যা সুতো কাটা দেখেনি। ঘূরন্ত মাকু দেখে অবাক হয়ে গেল রাজকন্যা।

—কি ওটা? রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলো।

বুড়ী বললে, কোনটা?

—যেটা কেবল ঐ ঘুরে চলেছে?

—ওটা মাকু। বুড়ী বললে।

—আমি সুতো কাটবো। রাজকন্যা বললে।

—বেশ তো কাটো, বুড়ার মুখে হাসি।

রাজকন্যা মাকুটা ধরতেই তার আঙ্গুলে খোঁচা লাগলো। একফোঁটা রক্ত বের হলো।

অমনি দারুন ঘুম পেলো রাজকন্যার। ঘরের ভেতর একটা বিছানা ছিল। রাজকন্যা তার উপর গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়লো।

কোন মন্ত্রবলে যেন প্রাসাদের সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিল সেই মুহূর্তে। সেলাই কাজ করতে করতে প্রাসাদের সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমিয়ে পড়লো প্রাসাদের দাসদাসী। যে যেই কাজ করছিল সেই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লো। রাঁধুনী, চাকর, ঠাকুর, দাস-দাসী সব ঘুমিয়েছে কর্মরত অবস্থায়।

রাজা আর রাণী প্রাসাদে ফিরে এলেন। হলঘর পার হয়ে প্রাসাদে আসতেই তারাও ঘুমিয়ে পড়লো। ঘোড়া ঘুমালো, কোচম্যান ঘুমালো। বেড়াল, কুকুর সবাই ঘুমালো।

প্রাসাদের পশু পাখীরাও ঘুমিয়ে পড়লো। পায়রা বকম্-বকম্ করতে করতে ঘুম লাগালো। বিড়াল দুধ খেতে খেতে ঘুমালো। কুকুর মাংস খেতে খেতে ঘুমালো।

প্রাসাদের মাথায় ছিল একটা রাজপতাকা। সেটাও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ক্রমে বহুদিন কেটে গেল। সমস্ত দেশে প্রচারিত হলো যে, কাঁটার ঝোপ আর গোলাপ বনের ভেতর দিয়ে প্রাসাদদুর্গ আছে।

ঐ প্রাসাদদুর্গের মধ্যে পালঙ্কে ঘুমিয়ে রয়েছে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা। সবাই বলতো তাকে ঘুমন্ত সুন্দরী।

বহু দেশ থেকে বহু রাজকুমার, বহু বীরপুরুষ এসে কাঁটাঝোপ আর গোলাপবনের ভেতর দিয়ে প্রাসাদদুর্গে যেতে চেষ্টা করতো রাজকন্যার কাছে। কিন্তু কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হতো, পোষাক ছিঁড়ে যেতো।

এমনি করে দিন, মাস, বছর কাটলো। ক্রমে কেটে গেল একশো বছর।

দূর দেশের এককুমার এই ঘুমন্তপুরীর ঘুমন্ত সুন্দরীর কথা শুনেছিল। ভাবলো, দেখা যাক চেষ্টা করে দেখতে পাওয়া যায় কি না।

রাজকুমার আসতেই গোলাপের রাজ্যে আনন্দের সাড়া জাগলো। হাজার হাজার সুগন্ধী গোলাপ ফুটে উঠলো। তার ভেতর দিয়ে একটা পথ দেখা গেল।

সেই পথে রাজপুত্র সহজেই সেই ঘুমন্ত পুরীতে যেতে সক্ষম হলো। একশো বছর পার হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে অভিশাপের কাল।

রাজপুত্র প্রাসাদে ঢুকলো। বিরাট হলএর ভেতর দিয়ে পা টিপে টিপে এলো। রাজা ঘুমাচ্ছেন, রাণীও ঘুমাচ্ছেন, সভাসদরা ঘুমাচ্ছেন, সবাই নিদ্রামগ্ন।

সামনে সরু ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল রাজপুত্র। একেবারে ঘুমন্তপুরী। কোন শব্দ নেই। তার পায়ের শব্দটুকু শোনা যেতে লাগলো।

রাজপুরীর নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিল এই রাজপুত্র তার পদভারে। চারিদিকে সেচাইছে আর চলছে।

রাজকন্যা যে ঘরে যে পালঙ্কে মরণঘুমে আচ্ছন্ন ছিল সেখানে এলো রাজপুত্র। সে ঘুমন্ত রাজকন্যার দিকে চেয়ে রইলো।

রাজপুত্র এত সুন্দরী রাজকন্যা কখনো দেখেনি। নিচু হয়ে সে রাজকন্যার মাথায় হাত বুলালো। অমনি রাজকন্যার যাদুনিদ্রা কেটে গেল।

রাজকন্যা জেগে গেল। চোখ মেলতেই ঠোঁটে ফুটে ওঠে একটু হাসি। চেয়ে থাকে রাজপুত্রের দিকে।

এরপর রাজা জাগলেন, রাণী জাগলেন, আর জাগলেন সভাসদরা। ঠাকুর, চাকর, ঝি, দাস-দাসী সবাই জাগলো। জাগলো বেড়াল, কুকুর, পাখীরা।

আস্তাবলে ঘোড়া জাগলো। সহিস জাগলো। দারোয়ান, সিপাই-সান্ত্রী সবাই জাগলো।

পায়রার বক্-বক্ম শোনা গেল। চুল্লীর নিভে যাওয়া আগুন জ্বলে উঠলো।

সমস্ত ঘুমন্ত রাজপুরী একশো বছর পরে আবার জেগে উঠলো। যে যার কাজে ব্যস্ত হলো।

রাজা রাজার দরবারে গেলেন। রাণী নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন। সভাসদরা সভায় যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পরে সেই রাজকুমারের সঙ্গে সেই অভিশপ্ত রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। এই বিয়েতে খুব ধূমধাম হলো।

বহু দেশবিদেশের রাজা-মহারাজারা এই বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। কত রাজপুত্র এলেন।

চারিদিকে খাওয়া, আর গানবাজনা চললো। শুধু আনন্দের শিহরণ জাগে রাজবাড়ীতে।

এক সপ্তাহ ধরে চলে তার সমারোহ ব্যাপার। একশো বছর পর যে আবার আনন্দের বন্যা বইলো।

—

সত্যি রাজকন্যা

[ইউরোপ]

অনেকদিন আগে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একটা মাত্র ছেলে ছিল। সে বেশ বড় হয়েছে।

রাজা আর রাণী ঠিক করলেন এবার ছেলেটার বিয়ে দিতে হবে। নানা দেশ থেকে তার সম্বন্ধ নিয়ে দূত আসতে লাগলো।

তাঁরা তাঁদের রাজকন্যার রূপ-গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। রাজপুত্রের সঙ্গে যেমন-তেমন মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।

তার বিয়ে হবে রূপ-গুণ সম্পন্ন অনন্যসাধারণ কন্যার সঙ্গে। সে অবশ্যই রাজকন্যা হবে।

এই রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, সে যাকে বিয়ে করবে সে শুধু রাজ কন্যাই হবে তা নয়, রূপে-গুনে ও তার মেজাজও সত্যিকারের রাজ-কন্যার মত হবে।

তাই দূতের মুখের কথা শুনে রাজপুত্র তার মতামত জানালো না। তিনি দেশে দেশে ঘুরে রাজকন্যাদের সচক্ষে দেখে আসবেন।

অনেক দেশে ঘুরে রাজকন্যা দেখে বেড়ালেন। কিন্তু কোন রাজ-কন্যাকেই তার পছন্দ হলো না। রাজকন্যার যেমন হওয়া উচিৎ তেমন নয়।

তাই হতাশ হয়ে রাজপুত্র ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। কেবল তিনি একটা কথা ভাবেন, কি হবে তবে ?

রাজপুত্রের মনে কোন শান্তি নেই, সুখ নেই। তাই রাজারাণীর মনেও অশান্তি দেখা দিল।

এরপর একদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড় হলো। সোঁ-সোঁ, বোঁ-বোঁ করে বাতাস বইলো। সারা আকাশ হোল কালো মেঘে ঢাকা।

সে জলে ভরা মেঘকে ছিন্ন-চ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বিদ্যুৎ-এর ঝলক।

মেঘ ডাকতে লাগলো গুরু-গুরু করে। বাজ পড়তে লাগলো বারবার। কড়্-কড়াৎ শব্দ হতে লাগলো।

এরপরই আকাশ ভেঙ্গে নামলো প্রচণ্ড বৃষ্টির ধারা। পৃথিবীর বুকে শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি। ভীষণ সেই বৃষ্টি।

সহসা রাজা একটা শব্দ শুনলেন। সেই প্রাসাদের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে।

এই দুর্যোগের রাজ্যে কে বাইরে যাবে? আর কেই বা বাইরে আছে? দাস-দাসীরা নিজেদের ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাদের না ডেকে রাজা নিজেই দরজা খুলতে গেলেন।

রাজা দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য! বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটি অল্পবয়সী কন্যা। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কন্যার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

মনে হলো যেন এইমাত্র স্নান করে এলো কন্যাটি। তার পোষাক আর চুল থেকে জল ঝরে পড়ছে। ভীষণ ঠাণ্ডায় কন্যাটি ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে।

—সেকি? তুমি কে? কোথা থেকে এলে? এসো, ভেতরে চলে এসো।

মেয়েটি প্রাসাদের ভেতর এলো। রাজা তাকে নিয়ে এলেন রাণীর কাছে।

রাণী তাকে কতকগুলো পোশাক দিলেন পরে নিতে। তারপর তাকে খেতে দিলেন কাছে।

কন্যাটিকে দেখতে খুব সুন্দর। সে সব কিছু খেয়ে নিলে পরে রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ গো, তুমি কে? এমন ঝড়-বৃষ্টির রাতে বের হয়েছো কেন?

—আমি দূর দেশের এক রাজকন্যা। একটা দৈত্য আমায় চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। দৈত্যটা ছিল বেশ বোকা। তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছি।

—তুমি রাজকন্যা? সত্যি?

পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলেন রাণী। মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমার ঘুমবার ব্যবস্থা করে আসি।

এবার রাণী নিজের শোবার ঘরে এলেন। বিছানার চাদর তুলে তার নিচে রাখলেন একটা মটরদানা। চাদরটা তার উপর আবার পেতে দিলেন। তারপর দিলেন বেশ কিছু গদী। তার উপর দিলেন কতকগুলো তোষক।

রাণী এবার গেলেন কন্যাটির কাছে। বললেন, এসো মা, তোমার শোবার ব্যবস্থা করে এসেছি। ঘুমাবে চলো। তোমার শয্যা দেখিয়ে দিই।

পরদিন প্রভাতকাল। রাণী সেই কন্যাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাতে কেমন ঘুম হলো?

— না-না, কালরাতে একটুও আমি ঘুমাতে পারিনি রাণীমা।

—কেন, বলোতো? রাণীর প্রশ্ন।

বিছানার ভেতর কিছু একটা শক্ত জিনিস ছিল। তাতে গায়ে সারারাত ব্যথা লেগেছে। সে এক অসহ্যকর যন্ত্রণা!

এবার রাণী বুঝলেন যে, এটি সত্যিই রাজকন্যা! এত গদী, এতগুলো তোষক এবং সুন্দর চাদরের তলায় একটা মটরদানা তাকে গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছে সারারাত।

এতদিনে কি তাহলে সত্যিকারের রাজকন্যা পাওয়া গেল? কিন্তু কোথা থেকে এলো সে?

খবর গেল রাজকুমারের কাছে। খবর পেয়ে কুমার দেখতে এলো। দেখি গিয়ে কেমন সেই রাজকন্যাটি।

রাজকন্যাটিকে বারবার দেখতে লাগলেন রাজপুত্র। বললেন, তাহলে এতদিনে সত্যিকারের রাজকন্যা পাওয়া গেল?

রাজপুররীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল তাকে নিয়ে।

ঝড়ের রাতে রাজকন্যা এসেছে এই রাজপ্রাসাদে। বেশ সুন্দরী।

বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবার। কিন্তু রাজপুত্রের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে তার পছন্দ হয়েছে কিনা।

রাজা তাই বললেন রাণীকে, জিজ্ঞাসা করে দেখ আগে, রাজপুত্রের পছন্দ হয়েছে কিনা।

রাজপুত্র এবার মায়ের কাছে রাতের সব কথা শুনলো একে একে। শুনে একটু হাসলো।

—না, আমার কোন আপত্তি নেই, রাজপুত্র বললে খুশী হয়ে।

রাজবাড়ীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রাজকন্যার কাছে তার দেশের নাম এবং বাবার নাম শুনে তাঁকে খবর পঠিয়ে দিলেন।

খবর দিলেন, আপনার হারানো মেয়েকে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির রাতে আমাদের রাজপ্রাসাদের দ্বারে পাওয়া গেছে ভেজা পোষাকে। তারপর সে এখানে আছে মহাসুখে। তারসঙ্গে আমার রাজপুত্রের বিয়ে দেবো। রাজপুত্রের পছন্দ হয়েছে আপনার কন্যাকে।

খবর পেয়ে রাজকন্যার বাবা সেই রাজা খুশী হয়ে খবর দিয়ে ছুটে এলেন নানা দ্রব্যসামগ্রী উপহার নিয়ে।

আনন্দের সাড়া পড়ে গেল রাজপুরীতে। সেই রাজা এসে তাঁর হারানো মেয়েকে পেয়ে কি যে খুশী হলেন তা বলার নয়।

তারপর খুশী হয়ে বিয়েতে মত দিলেন।

উপহার সামগ্রী নিয়ে যারা রাজার সঙ্গে এসেছিল তারা সব দিলেন বিয়ের জন্য উপহার। দুই দেশের রাজা একত্রে বসে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠলেন।

এরপর শুভদিনে শুভসময়ে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

মহা ধুমধাম করে বিয়ে হলো। রাজ্যের বহু লোক পেট পুরে খেলো সেই বিয়েতে। চারিদিকে হৈ-হৈ, রৈ-রৈ কাণ্ড বেধে গেল।

রাজপুত্র গর্ব করে সেই মটরদানাটি রেখে দিল কাছে। এটাই চিনিয়ে দিয়েছে প্রকৃত রাজকন্যাকে।

রাজপুত্র মহাসুখে দিন কাটালো রাজকন্যাকে স্ত্রী রূপে লাভ করে। সারা রাজ্যের মানুষ খুব আনন্দ করলো অনেক দিন ধরে।

সিনড্যারেলা

[ফ্রান্স]

একটি মেয়ে ছিল। তার নাম সিনড্যারেলা। খুব সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু তার কপালটা খুব মন্দ।

সিনড্যরেলার বাবা-মা কেউ ছিল না। কেবল ছিল সংমা আর দুটি সংবোন। দিনরাত ওরা খাটিয়ে মারতো ঐ সুন্দরী মেয়েটাকে।

তারা ভাবতো এই সব কাজ করাতে করাতে সুশ্রী চেহারা বিশ্রী হয়ে যাবে। তাই তাকে খাটাতো।

সিনড্যারেলা খুব ভালো মেয়ে ছিল। তাই তার কাজে সাহায্য করবার জন্য বন থেকে ছুটে আসতো অনেক ছোট-ছোট প্রাণী।

তারা হলো খরগোস, কাঠবেড়ালী, প্রজাপতি ইত্যাদি বহু প্রাণী। তারা সাহায্য করতো সিনড্যারেলাকে।

এমনিভাবে দিন কাটে মেয়েটার। একদিন রাজ্যের সব মেয়েকে নেমন্তন্ন করা হলো রাজবাড়ীতে। কারণ, সব মেয়েদের ভেতর থেকে রাজপুত্র মনোমত তার পাত্রী বেছে নেবেন। যে মেয়েকে তাঁর পছন্দ হবে তাকেই তিনি রাজবাড়ীর বধু করে নেবেন।

সংমা তার দুটি মেয়েকে ভালো পোষাক পরিয়ে রাজবাড়ীতে পাঠাতে চাইলেন। তারা প্রস্তুত হলো। তা দেখে সিনড্যারেলা বললে, মা, আমিও যাই রাজবাড়ীতে।

সংমা রেগে মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, তুই? তুই রাজবারড়ী যাবি কোন কাজে?

সে বললে, কোনদিন তো রাজবাড়ী দেখিনি, তাই গিয়ে দেখবো কি রকম নেমন্তন্ন। দেখবো কতরকম খাবার। দেখবো চেয়ে কত আলো আর চাকচিক্য।

সংমা বললে, খুব হয়েছে। তোর যা বিশ্রী চেহারা। রাজবাড়ির ঝি-চাকররাও তোর দিকে চাইবে না! না, তোর যাওয়া হবে না। তুই

বাড়িতে থাকবি। ঘর-দোরগুলো ঝাঁট দিবি, থালা-বাসন পরিস্কার করবি। তাছাড়া একগাছা ময়লা-কাপড় রইলো, সেগুলো কেচে সাফ করে শুকাবি।

সৎমার ভয় হয়েছে। পাছে রাজবাড়ীতে গেলে রাজকুমারের শুভ-দৃষ্টিতে পড়ে যায় এই সুন্দরী সিনড্যারেলা, তাহলে সে হবে রাজবাড়ীর বৌ। একথাটা ভাবতেও সৎমায়ের বুকটা হিংসায় জ্বলে ওঠে।

সৎমা মেয়েদুটিকে সাজিয়ে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল। যাবার সময় সুন্দরী সিনড্যারেলাকে বার বার বলে গেল, যা যা কাজ তোমায় করতে বলে গেলাম সেগুলো সব করে রেখো। বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেয়োনা।

হতভাগিনী সিনড্যারেলা একা পড়ে থাকে এই বাড়িটাকে। এর আসল নাম হলো এলা। আর এই নামটার অর্থ সিনড্যারেলা অর্থাৎ হলো গিয়ে অঙ্গার। যে পুড়ে গেছে, অথচ ছাই হয়নি।

সারাদিন তার কাজ আর কাজ। কাজের মাঝে সে বিশ্রাম করতো চিমনীর কোণায় বসে, পা দুটো থাকতো অঙ্গারের ভেতর। তাঁর নামও এইজন্য হয়ে গেছে সিনড্যারেলা।

সৎমা তার দুটি মেয়েকে নিয়ে রাজবাড়ি চলে গেলে সিনড্যারেলা চিমনীর কোনায় গিয়ে বসলো যথারীতি। মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলো।

সহসা তার ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। একটি সুন্দরী পরী ঢুকলো। সিনড্যারেলা তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—কাঁদছো কেন? পরীটা বললে।—তোমার কান্না দেখে না এসে থাকতে পারলাম না তাই চলে এলাম। আমি তোমার ধর্মমা। যাতে তুমি রাজবাড়ী যেতে পারো তাই এলাম।

—কি করে আমি রাজবাড়ী যাবো? আমার তো কোন ভাল পোষাক নেই। কাঁদতে কাঁদতে সিনড্যারেলা বললে।

—সব ব্যবস্থা করবো। চিন্তা নেই। বাগান থেকে একটা ভাল কুমড়ো নিয়ে এসো তো?

—সেকি! কুমড়ো কি হবে?

—আগে নিয়ে এসো। পরে বলছি সব। সিনড্যারেলা বাগানে ছুটে গিয়ে একটা খুব ভালো কুমড়ো নিয়ে এলো। পরী কুমড়োটার উপর তার যাদুকরী কাঠি বুলালো। আর অমনি ওটা হয় গেল একটা চমৎকার জুড়ী-গাড়ী।

এমন চমৎকার গাড়ী যাতে রাজপুত্র আর রাজকন্যাই চড়তে পারে। মনোমুগ্ধকর সেই গাড়ী।

এবার পরীমা বললে, যাও, এবার একটা ইঁদুর ধরা কল নিয়ে এসো।

সিনড্যারেলা এবার ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে একটা ইঁদুর ধরা কল নিয়ে এলো। কলে ছ'টা ইঁদুর ধরা পড়েছে। সবকটা জ্যান্ত ইঁদুর। পরীমার সামনে কলটা রাখলো সিনড্যারেলা। পরীমা সেই ছ'টা ইঁদুরের গায়ে যাদুকরী কাঠি বুলিয়ে দিল।

মুহূর্তে ছ'টি ছাই রঙের ঘোড়া হয়ে গেল। ঘোড়াগুলোর গায়ে ফুটকি দাগ। তারা পিছনের পা দুটো তুলে লাফাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না তারা। সেই মুহূর্তে ছুটতে চাইছে তীব্রবেগে।

—যাও, একটা ধেড়ে ইঁদুর ধরে নিয়ে এসো।

সাত্যি অন্য একটা কলে একটা ধেড়ে ইঁদুরও পড়েছিল। তার মুখে লম্বা গালপাট্টা। সিনড্যারেলা কলটা নিয়ে এলো। পরীর যাদুকরী কাঠির ছোঁয়ায় ধেড়ে ইঁদুর কোচম্যান হয়ে গেল।

পরীমা বললে, আবার বাগানে যাও। সেখান থেকে বড় ছটা টিকটিকি নিয়ে এসো এখানে। বাগানে জলে রাখার বড় পিপেটার পেছনে তারা রয়েছে, যাও। এবার সিনড্যারেলা নির্দেশ মতো ছটি টিকটিকি নিয়ে এলো।

পরীমার যাদুকরী কাঠির ছোঁয়ায় তারা হয়ে গেল ছ'জন চাপরাসী। পরনে তাদের সবুজ আর সোনালী রঙের পোষাক। তারা গাড়িতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো। পরীমায়ের কৃপায় সিনড্যারেলার গাড়ি, ঘোড়া, চাপরশী সব হলো। এবার তার পালা।

পরীমা সিনড্যারেলার সারা গায়ে যাদুকরী কাঠি বুলিয়ে দিল। ব্যাস! কোথায় গেল তার ছেঁড়া হাজার তালি দেওয়া পোষাক।

তার পরনে দেখা গেল জরীর কাজ করা দামী দামী পোষাক। সর্বাঙ্গ চক্চকে ঝক্ঝকে ! মাথার চুল পর্যন্ত সুন্দর করে বাঁধা।

পোষাক থেকে আসছে দামী সুন্দর আতরের গন্ধ। দুটি পায়ে কাজ করা দু'পাটি ঝক্মকে জুতো। সিনড্যারেলা নিজের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়, চিনতেই পারে না। হাসে মৃদু মৃদু।

এবার পরীমা তাকে গড়িতে তুলে দিয়ে বললে, শোন মা, তোমাকে একটা কথা বলে দিই। রাজবাড়ির ঘড়িতে রাত বারোটা বাজবার আগেই তুমি ফিরে অসবে। না এলে বিপদে পড়বে।

ছ'ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চললো রাজবাড়ীর দিকে। রাস্তার সবাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো এই সুন্দর গাড়িটা। নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো, এগাড়িটা কার ?

—অন্য কোন দেশের রাজার হবে।

—গাড়ির ভেতরকার সুন্দরী মেয়েটি কোথাকার ?

—কোন রাজকন্যা নিশ্চয়ই।

সেই রাজবাড়ির ফটকের সামনে এসে থামলো তার সুন্দর ছয় ঘোড়ার জুড়ি গাড়ি খানা। সেপাই সান্ত্রীরা তাকে সেলাম জানালো।

ফটকের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলে গেল ভেতরে, রাজবাড়ির উঠানে। সবাই চেয়ে দেখে সুন্দরীকে।

রাজপুত্র নিজে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। সবাই বলতে লাগলো, কি সুন্দর মেয়েটি। রাজকুমারের নিশ্চয়ই একেই পছন্দ হবে।

নাচ গান খাওয়া গাওয়া বললো রাজবাড়ীতে। দেশের সব সুন্দরী মেয়েরা আজ জড়ো হয়েছে রাজবাড়ীতে। তারা সবাই নিমন্ত্রিত এখানে। চারিদিকে সুন্দর বাজনা বাজছে। কেউ গাইছে, কেউ নাচছে। কি আনন্দের ফোয়ারা চারিদিকে ! কোথাও দুঃখ নেই।

সেদিন সমস্ত সন্ধ্যাটা সিনড্যারেলা নাচলো রাজকুমারের সঙ্গে। সিনড্যারেলার ঘড়ির দিকে চাইবার অবকাশ নেই।

—তুমি কোথায় থাকো ? তোমার নাম কি ? রাজকুমার তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

রাজকুমারের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আর বলা হলো না। কানে এলো ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ। সিনড্যারেলা ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে গেল। সর্বনাশ! বারোটা বাজে!

পরীর কথা তার মনে হলো। তাকে সে কতবার সাবধান করেছে। রাত বারোটার আগে ফিরবে।

পরে ঢং করে আর একবার ঘড়ির শব্দ হতেই সিনড্যারেলা ছুটলো। রাজকুমারও তার পিছু ছুটলো।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সিনড্যারেলার পায়ের জুতোর একপাটি খুলে পড়ে গেল। তার খেয়াল নেই সেদিকে। রাজকুমার সেটা কুড়িয়ে নিলেন।

সে ছুটে ফটক পার হলো এবং তার গাড়িতে উঠে বসলো। ঠিক তখনই ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

অমনি কর্পুরের মত হাওয়া হয়ে গেল সিনড্যারেলার জুড়ি-গাড়ি সিপাই-সাস্ত্রী আর আর পোশাক-পরিচ্ছদ সব। সে ছেঁড়া পোষাকে রাস্তায় দাঁড়ালো।

তার খেয়াল হলো সৎমা ফিরবার আগে তাকে বাড়ী ফিরতে হবে। নইলে মেরে ফেলবে তাকে সৎমা।

সিনড্যারেলা হেঁটেই বাড়ি ফিরলো। তখনও সৎমা ও বোনরা বাড়ি ফেরেনি।

তারা বাড়ি ফিরে সিনড্যারেলাকে বললেন, একটা দামী জুড়ি-গাড়ি এসেছিল, তাতে দামী পোশাক পরে বসেছিল সম্ভবতঃ এক রাজকন্যা। কি তার রূপ! যেন পরী! রাত হতে ছুটে চলে গেল সে রাজবাড়ীর বাইরে।

যাবার সময় সেই কন্যার পায়ের একপাটি জুতো রাজবাড়ীতে পড়েই রইলো। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি তার পিছু ছুটতে ছুটতে জুতোখানা কুড়িয়ে নিলেন। হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন বারংবার।

সব কথা শুনলো সিনড্যারেলা। একটু মৃদু হাসলো মাত্র। জবা দিল না।

কয়েকদিন পরে রাজবাড়ীর লোকেরা ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করে দিল শহরে ও গ্রামে, "রাজবাড়ীতে একটি মেয়ের পায়ের জুতো পাওয়া গেছে, যে মেয়ের পায়ে সেটা লাগবে তাকে রাজপুত্র বিয়ে করবে।"

এরপর সেই জুতোপাটি নিয়ে রাজবাড়ির লোকেরা সব বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের পায়ে পরাতে চেষ্টা করলো। সব মেয়ে পা লাগায়, পায়ে লাগে না জুতোটা। ছোট হয় জুতোটা।

অবশেষে একদিন তারা সিনড্যারেলার বাড়ির সামনে এলো জুতো পায়ে লাগিয়ে দেখতে। তার দুটি সৎবোন আগে জুতোতে পা গলাবার কত চেষ্টা করলো, কি সফল হলো না পায়ে লাগে না।

সিনড্যারেলা জুতো দেখে চিনতে পারলো এটা তার পায়ের। একপাটি। রাজবাড়ির লোকেরা তাকে চিনতে পারলো। তারা তাকে জুতোতে পা দিতে বললে। সেও এগিয়ে গিয়ে জুতোতে পা গলালো।

জুতোটা দিব্যি তার পায়ে লেগে গেল। সিনড্যারেলা খুশী হলো। বোন দুটো বললে, নোংরা চেহারায় এই জুতো পারে মানাবে কি ?

আর একজন বললে, পোশাকের দূরবস্থায় এই জুতো ভালো মানাবে। আমাদের পায়ে তো লাগবে না, যে ঝিয়ের মত কাজ করে তার পায়ে লাগবে।

রাজপুত্রের লোকেরা খুব খুশী হলো। বললে, এটা কি আপনার জুতো ?

সিনড্যারেলা মাথা নিচু করে স্বীকার করে।

—তবে এবার আমাদের সঙ্গে চলে আসুন রাজবাড়ী। রাজকুমার আপনাকে বিয়ে করবেন।

—কি করে এই ময়লা এবং ছেঁড়া পোশাক পরে যাবো ?

—আমরা সময় দিচ্ছি, আপনার পোশাক পাল্টে নিন। আমরা এখানে বসে আছি। আমাদের সঙ্গে রাজবাড়ী যাবেন।

এবার সিনড্যারেলা ঘরে এসে চিমনীর পাশে বসে কাঁদতে লাগলো।

সহসা পরীমা এলো। এসে বললে, কেন মা তুমি কাঁদছো ? আর কাঁদবে না এই তোমায় নতুন পোশাক দিচ্ছি।

এইকথা ক... তার গায়ে যাদুকরী কাঠি ছুঁইয়ে দিলে পরীমা। অমনি তান ছেঁড়া মলিন সুন্দর দামী পোশাকে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তার মাথার চুলগুলো বেনীবদ্ধ ও সুগন্ধী হলো। পরীমা আর এক পাটি জুতোও দিলে। গায়ের সুন্দর পোশাক থেকে দামী আতরের গন্ধ বের হতে লাগলো।

সিনড্যারেলাকে এখন চেনা যায় না। যেন সত্যিই সে রাজকন্যা।

তারপর পরীমা শূন্যে যাদুকরী কাঠি একবার ঘুরাতেই সেই জুড়িগাড়ি এসে গেল। সে গাড়িতে উঠে বসলো।

গাড়ি ছুটে চললো রাজবাড়ীর দিকে। সেদিকে চেয়ে থাকে তার হিংসুটে মা-বোনেরা। তারা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে এটা কি করে হলো? কোথায় পেল সে দামী পোশাক আর জুড়িগাড়ি?

—রাজপুত্রই দিয়েছে গোপনে নিশ্চয়।

—তাই হবে হয়তো।

এরপর সিনড্যারেলার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। তারা মহা-সুখে রাজ বাড়ীটাকে দিন অতিবাহিত করে লাগল।

হ্যামেলিনের বাঁশীওলা

ছোট একটি শহর হ্যামেলিন। সেখানে এসে জুটেছে যত সব ইঁদুর। শহরবাসীরা ভীষণ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের উৎপাতে।

ইঁদুরের জ্বালায় কোথাও এতটুকু খাবার রাখবার উপায় নেই। শহরের সব খাবার ইঁদুরেরা খেয়ে ফেলে। মহাবিপদ সর্বত্র। উপায় কি করা যায়!

সেই শহরের যিনি রানী তাঁর মন ছিল খুব ছোট। শহরের ছোট-বড় লক্ষ লক্ষ ইঁদুর তাড়াতে টাকা খরচ করতে তিনি রাজী নন। তিনি কেবল বলতেন, গেল! গেল! সব গেল ইঁদুরেরা সব খেয়ে ফেললে! আমার খাবারও খেয়ে নিচ্ছে!

এই ভীষণ ছুরবস্থায় একদিন এই রাজসভাতে এলো এক অদ্ভুত লোক। তার হাত একটা বাঁশী। সে মাথা নত করে রানীকে সম্মান করলে।

রানী জিজ্ঞাস করলে, তুমি কি মনে করে? কোথা থেকে আসছো?

মাথা নুইয়ে লোকটা এবার বললে, রানীমা, আমি অনেক দূরদেশ থেকে আসছি। শুনেছি এখানে নাকি খুব ইঁদুরের উৎপাত। সত্যি কি?

—ঠিক বলছো। রানী বললে।

—আমি শহর থেকে সব ইঁদুর তাড়িয়ে দিতে পারি। রাজী আছেন?

—বেশ, দাও তাড়িয়ে। খুশী হবো।

—তাহলে আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?

—আমি হলাম হ্যামেলিনের রানী। আমি বলছি তুমি যদি শহরের সব ইঁদুর তাড়াতে পারো তাহলে তোমাকে এক ব্যাগ সোনার মোহর দেবো।

—ঠিক বলছেন তো?

– হ্যাঁ, আমি ঠিক কথাই বলছি। রেগেই রানী জবাব দিলেন।

এবার রাজবাড়ীর বাইরে চলে এলো সেই অদ্ভুত বাঁশীওয়লা। রাস্তার দাঁড়িয়ে হাতের বাঁশিতে ফুঁ দিলে অদ্ভূত সুরে। সেই অদ্ভূত সুরে বাঁশী বাজতে থাকে। এক নাগাড়ে বেজে চলে।

আর যাছুকরী সুরে হ্যামেলিন শহরের সব ইঁদুরগুলো ছুটে এলো তার সামনে, পেছন, বাঁয়ে ও ডাইনে। নানা জাতের ইঁদুর। ছোট ও বড় সবাই, সমস্ত রাস্তা ভরে গেল ইঁদুরে।

লোকটা এবার বাঁশী বাজতে বাজতে এগিয়ে চললো। পেছন পেছন চললে সব ইঁদুর। সব রাস্তা ভরে গেল ইঁদুরে। বাঁশীওলার পেছন পেছন তারা সবাই চলেছে পথ বেয়ে।

শহরের শহরের ছোট একটা নদী। লোকটা নদীর কাছে এসে থামলো। সব ইঁদুর এলো তার পেছনে।

নদীতে জল বেশী নেই। বাঁশীওলা হেঁটে নদী পার হলো বাঁশী

বাজাতে বাজাতে। ইঁদুরগুলো ও তার পেছন পেছন জলে নামলো। ফলে জলে ডুবে মারা গেল সব ইঁদুর।

বাঁশী বাজাতে বাজাতে নদী পার হলো বাঁশীওলা। সব ইঁদুর মারা গেছে জলে হাবু ডুবু খেয়ে। শহরে আর একটি ইঁদুরও রইল না।

এবার বাঁশীওলা রানীর কাছে এলো। এসে পুরস্কার চাইলো। রানীর পুরস্কার দেবার ইচ্ছা নেই। রানী ছিল অত্যন্ত কৃপণ। নেহাৎ বিপদে পড়ে দিতে চেয়েছিল পুরস্কার স্বরূপ এক ব্যাগ মোহর।

—আপনার কথা রক্ষা করুন রানীমা।

রানী বললে, তুমি চলে যাও আমার সামানে থেকে। যাও বলছি, একমুহূর্তে দেরী কোর না।

রানীর হুকুমে বাঁশীওলা চলে গেল রাজদরবারে থেকে রাস্তায়। বলে গেল, এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।

—বেশ, যা পারো কোর। মূল্য পাবে না।

রাস্তার গিয়ে বাঁশীওলা আবার বাঁশী বাজাতে থাকে। নতুন এক সুরে বাজায় বাঁশী। সেই সুর শুনে শহরের সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো তার কাছে। সে বাঁশী বাজিয়ে এগিয়ে চললো পথ বেয়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তারাও বাঁশীওলার পিছু পিছু চললো।

বাঁশী বাজাতে বাজাতে লোকটা একটা পাহাড়ের কাছে এলো। পাহাড়ের এক জায়গায় বড় একটা গুহা ছিল। বাঁশী বাজাতে বাজাতে সে গুহার ভেতর ঢুকলো। ছোট ছেলেমেয়েরা তার পিছু পিছু ঢুকলো গুহার মধ্যে।

বাঁশিওয়ালা বাজনা থামিয়ে চট করে বের হয়ে এলো এবং গুহার মুখটা বড় একটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিল। হ্যামেলিন শহরের সব শিশুরা গুহার ভেতরে আটকে গেল।

গুহার খবর বাঁশীওলা ছাড়া কেউ জানেনা। কৃপণ রানীর উপর প্রতি-শোধ নিল এবার।

হ্যামেলিন শহরের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠলো। স্কুল, বাড়ি, বাগান নিস্তব্ধ। বাগানের ফল ফুল সব শুকিয়ে গেছে।

শহরের সব সব মা-বাবারা রানীর কাছে ছুটে এলো।—আমাদের বাচ্ছারা কোথায় গেল? এক বাঁশীওলার পিছু পিছু তারা কোথায় চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি। তাদের আনবার ব্যবস্থা করুন। তাদের ছেড়ে আমরা বাঁচবোনা।

—আমার কাছে কেন? আমি আমি কি করবো?

—আপনি বাঁশীওয়ালাকে ইঁদুর মারার জন্য এক ব্যাগ মোহর দেবেন প্রতিজ্ঞা করেও দেননি, তাই সে সব শিশুদের এমনি করে হ্যামেলিন শহর থেকে কোথাও রেখে লুকিয়ে রেখে এসেছে।

—বাঁশীওলাকে কোথাও পাবো।

—খুঁজতে লোক পাঠান।

লোক পাঠানো হোল বাঁশীওয়ালাকে খুঁজতে। শেযে বাঁশী বাদক এলো। বললে, আমার প্রাপ্য মোহর দিন আগে রাণীমা। আমি শিশুদের উদ্ধার করে দিচ্ছি।

রানী নিরুপায় হয়ে তার তার দেওয়া কথা রক্ষা করলো একব্যাগ সোনার মোহর দিয়ে।

এবার বাঁশীওলা গেল সেই পাহারের গুহার ফলক খুলে দিতে। মুক্তি পেল সব শিশু। তারা হাসতে হাসতে ফিরে এল হ্যামেলিন শহরে।

কৃপণ রানী জব্দ হলো এইভাবে।

বাঘ বুড়ো

[সাঁওতালী রূপকথা]

একটা বুড়ো হাট থেকে বাড়ীতে ফিরে আসছিল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এখনি বনের হিংস্র পশুরা শিকারের জন্য বের হয়ে পড়বে। হাট থেকে ফিরবার পথে একটাও সাথী পায়নি বুড়ো।

তাই তার গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো। বুনো জন্তুর ভয় তো আছেই।

রাতের আঁধার নামলে ভূত ও দৈত্যরাও তো বেরিয়ে পড়বে। বুড়োটা তাই তাড়াতাড়ি পা চালায়।

বুড়োর কপাল সত্যিই খারাপ! যেতে যেতে সে পড়ে গেল একটা বিরাট বাঘের সামনা-সামনি। বাঘের সামনে খাদ্য। বাঘ মহাখুশী।

সে বুড়োকে খাবার জন্য এগোলো। বললে, বুড়ো, এবার তোকে খাবো।

বুড়োটা বললে, আমাকে খেয়ো না। আমাকে খেলে তোমার বিয়ের ঘটকের কাজ করতে পারবো না যে।

—সে আবার কি কাজ? ঘটকের কাজ কি? বাঘ অবাক হয়ে গেল।

—খুব দরকারী কাজ ওটা। আমি যে একজন ঘটক। ইচ্ছে করি যদি তবে একজনকে ছ'জন করে দিতে পারি।

—বেশতো, ভাল কাজ। বেশ, আমি একজন আছি। আমাকে ছ'জন করে দাও দেখি কেমন পারো!

—তাহলে তুমি আমার থলির ভেতর ঢোকে।

—বেশ, তাই ঢুকছি।

বোকা বাঘ ঢুকে পড়লো বুড়োর থলির ভেতর। অমনি বুড়ো চট করে থলির মুখটা বন্ধ করে দিল। বাঁধন দিলে শক্ত করে দড়ি দিয়ে। তারপর লাঠি দিয়ে খুব মারতে লাগলো! বাঘটা ভীযন যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকে।

বুড়ো মৃদু হেসে বললে, অত সহজে কি এ কাজ সম্ভব হবে? ছ'জন বানাতে হবে তো?

—তাই এত মার খেতে হবে?

—মার নয়। একটু মন্ত্র-তন্ত্র পড়তে পড়তে আঘাত একটু দিতে হয়।

—এত যে ব্যথা কখনো পাইনি আগে!

—ব্যথা একটু লাগবেই।

—আর কতক্ষণ সইতে হবে?

—সামান্য একটু সময়।

—তারপর কি হবে ?

—তারপর দু'জন হয়ে যাবে।

বুড়ো আবার বাঘটাকে মারতে থাকে। বাঘ দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকে।

সমগ্র বন কেঁপে ওঠে বাঘের ডাকে। বনের পশুরা কান পেতে শোনে এই গর্জন।

বুড়ো চারিদিকে তাকায় আর মারে প্রচণ্ড আঘাত। একের পর এক আঘার।

মার খেয়ে খেয়ে বাঘটা প্রায়টা আধমরা হয়ে যায়। গর্জন করে করে থেমে যায়। আধমরা হয়ে পড়ে বাঘটা।

এবার বুড়োটা বাঘশুদ্ধ থলিটা নদীর জল ফেলে দিয়ে আসে।

জলের ভেতর পড়ে হাবু-ডুবু খেতে খেতে প্রাণ তার যায় আরকি। বের হবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও বের হতে পারে না।

এবার থলিটা ভাসতে ভাসতে চলে যায় নদীর অপর পাড়ে। প্রাণ বাঁচাবার কত চেষ্টা করে বাঘটা।

একটা বাঘিনী সেই সন্ধ্যায় জল খেতে নদী ধারে এসেছিল। বাঘ ভর্তি থলিটা নড়তে নড়তে তার সামনে এলো।

এই বাঘটা কৌতুহলী হয়ে থলিটা কামড়ে কুলে তুলে নিল। কোন খাদ্য আছে কিনা এতে দেখে নিতে চাইলো।

তারপর থলিটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেললো। এবার থলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো পারের সেই বাঘটা।

তা দেখে এপারের বাঘিনীটা খুব খুশী হলো। ওপারের বাঘ ভাবলে তাহলে বুড়োটা তো মিছে কথা বলেনি। সে একা ছিল, এখন দু'জন হলো। বাঘ এবার সব কথা বললে বাঘিনীকে। তারপর তারা দু'জন চলল বনে।

—

লাল গোলাপ ও নাইটিংগেল

(ইংলণ্ড)

আমাকে সেই মেয়েটি কথা দিয়েছে যে যদি তাকে একটা লাল গোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে নাচবে।

কিন্তু আমার বাগানে যে একটিও লাল গোলাপ ফোটেনি। গভীর ব্যথায় তরুণ ছাত্রটি নিজের মনে বললে।

তখন ওক গাছের বাসা থেকে ছোট্ট নাইটিংগেল শুনতে পেলো তার মনের কথা। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সেই পাখীটিও খুঁজে বেড়াতে থাকলো লাল গোলাপ।

তরুণের সুন্দর দুটি চোখ জলে ভরে ওঠে। বললে, হায়! আমার বাগানে যে একটিও লাল গোলাপ নেই! ইস্! কত সামান্য জিনিস মানুষের মনকে খুশী করতে পারে। বড় বড় মনীষীদের রচনা আমি পড়েছি, দর্শনাস্ত্রের বহু জটির বিষয়ের সমাধান করেছি। আজ আমি একটি লাল গোলাপের অভাবে নিজের জীবনকে নিরানন্দ, অসহায় মনে করছি।

কত রাতে আমি তার গান করেছি। যদিও আমি জানতাম সে নেই। তবু এতদিনে সত্যিই আমি সেই এক প্রেমিকাকে দেখতে পেলাম। চুল যার মিশমিশে কালো, ঠোঁট দুটো যেন তার গোলাপের মতই লাল হয়ে উঠেছে। হতাশায় ও আকুলতায় মুখটা হয়েছে ফ্যাকাশে। আর ভ্রূযুগলের উপর পড়েছে বিষাদের ছায়া। নাইটিংগেল আপন মনে বলে চলেছে।

প্রেমিকের বুকের ব্যথা, চোখের জল এই নাইটিংগেলকে উদাস করে ফেললো। আবার তরুণ ছাত্রটির মনের ব্যথা ভেসে উঠলো, আগামীকাল রাতে রাজকুমার একটা বলনাচের ব্যবস্থা করেছেন। আমার প্রিয় মেয়েটি নাচবে সেই আসরে। আর আমি যদি ঐ

মেয়েটির হাতে একটি লাল তুলে দিতে পারি, তবেই সে আমার সঙ্গে সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত নাচবে।

হায়! যদি একটা লাল গোলাপ তাকে দিতে পারি! কিন্তু আমার বাগানে যে একটিও লাল গোলাপ ফোটে নি। তাই রেগে মেয়েটি আমার পাশ দিয়ে চলে যাবে। আমার দিকে ফিরেও চাইবে না। একথাটা ভাবতেও মনে আমার দারুন ব্যথা লাগছে।

বাস্তবিকই ছেলেটা তাকে ভালবাসে, অবাক হয়ে এইসব ভাবে নাইটিংগেল পাখী।

নাচের আসরে যন্ত্রীরা বসবেন তাঁদের নিজেদের আসনে। যন্ত্রের তারে-তারে তাঁরা সুরের মূর্ছনা তুলবেন। বেহালার ছড় টানার তালে তালে নাচতে থাকবে মেয়েটা।

মেয়েটি এত ধীর লঘুতালে নাচবে যে, মনে হবে যেন তার পা দুটো মাটি ছুঁয়েই যাচ্ছে না। ফুরফুরে হাওয়ার মত সে ভেসে বেড়াবে। ঝলমলে পোষাকপরা সভাসদরা তাকে ঘিরে থাকবে চারপাশে। দেখবে তার নাচ। কিন্তু আমার সঙ্গে নাচবে না সে। আমাকে এড়িয়ে সে চলে যাবে। তারজন্য যে লাল গোলাপ জোগাড় করতে সক্ষম হ নি!

ঘাসের উপর পড়ে দু'হাতে মুখ গুঁজে কাঁদে তরুণ ছাত্রটি। ছোট সবুজ গিরগিটিটা লেজ উঁচু করে দৌড়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ায় তরুণটিকে দেখে। জানতে চাইলো, কাঁদছো কেন?

শুনে প্রজাপতি সূর্যের আলোকে বললে, সত্যিই সে যে কাঁদছে। নরম ডেইজি ফুলটিও যেন জানতে চাইলো তার কান্নার কারণটা।

একটি মাত্র লাল গোলাপের জন্য এমনি করে কাঁদছে! নাইটিংগেল বললে।

শুধু একটি লাল গোলাপের জন্য অবাক হয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে তারা। এমন বোকামির কথা তো আর শোনা যায়নি।

গিরগিটিটা ব্যঙ্গ করে খানিকটা হেসে নিল সেদিকে চেয়ে।

নাইটিংগেল তরুণ ছাত্রটির কান্নার মর্ম বুঝলো। সমবেদনায় তার মন ভরে গেল। ওক গাছের ডালে বসে চুপ করে সে সব অনুভব করতে থাকে।

নাইটিংগেল পাখী তার বাদাম ডানা দুটি বাতাসে ছড়িয়ে দিল। বনের উপর দিয়ে সে উড়ে চললো বাগানের দিকে।

ঘাসে ভরা কেয়ারীর ঠিক মাঝখানে আছে একটি গোলাপ গাছ। তার উপর বসলো নাইটিংগেল।

বললে, দোহাই তোমার, আমায় একটি লাল গোলাপ দাও। পরিবর্তে আমি তোমায় মিষ্টি গান শোনাবো।

গোলাপ গাছটি মাথা নেড়ে না জানালো। বললে, আমার সব গোলাপ সাদা। পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফের মত সাদা। সাগরের ফেনার মত সাদা। তাই লাল গোলাপ দিতে পারিনে।

পরে বললে গাছটা, হ্যাঁ আমি দিতে পারি হদিস। যদি তুমি পুরোন সূর্য ঘড়ির কাছে আমার মায়ের কাছে যাও সে তোমায় একটা ফুল দিতে পারে।

সূর্যঘড়ির কাছে যে গোলাপ গাছটি আছে সেখানে নাইটিংগেল উড়ে গেল। তাকে গিয়ে বললে, ওহে গোলাপ গাছ, তোমায় মিষ্টিগান শোনাবো, তুমি একটা লাল গোলাপ দাও।

এই গাছটাও মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো—আমার গোলাপ হলদে। পাতালের মৎস্যকন্যা যে স্ফটিকের সিংহাসনে বসে আলো করে তার সোনালী চুলের মতোই আমার গোলাপের রঙ হলদে।

আরো বললে সে, কাস্তে দিয়ে কাটার আগে যে ড্যাফোডিল ফুটে ছিল আমার গোলাপ ফুল তার চেয়ে বেশ হলদে। তুমি যদি আমার ভায়ের কাছে যাও যে ছেলেটি জানালার নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে তোমার আশা পূর্ণ করবে।

নাইটিংগেল পাখী উড়ে চললো সেই গোলাপ গাছটার কাছে, যার কাছে তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে।

সেখানে গিয়ে সে একটি লালগোলাপ চাইলো, পরিবর্তে সে

মিষ্টিসুরে গান শোনাবে বললে তাকে।

গাছটা মাথা দুলিয়ে জানালো, আমি লালগোলাপ দিবে পারবো না। আমার গোলাপ লাল, পায়রার পায়ের তলার চেয়ে লাল। মহাসাগরে গভীরে যে প্রবাল তার চেয়েও লাল। কিন্তু শীতের হিমেল বাতাসে আমার অঙ্গগুলি জমাট হয়ে গেছে। কুয়াশা আমার গোলাপ কুঁড়িগুলি নষ্ট করেছে। আর ঝড়ের দাপটে আমার ডালপালাগুলো ভেঙ্গে গেছে। তাই এই বছর একটি গোলাপও ফোটাতে পারবো না।

—একটি গোলাপ হলেই চলবে। অতি বিনয় করে বললে নাইটিংগেল।

গোলাপগাছ বললে, আমি দিতে পারি। তবে সেটা তোমার খুব কষ্টকর হবে যা তোমাকে আমি এখনি বলবো।

—বেশ, বলো আমায় সেই উপায়টা বলো। আমি সব কষ্ট সহ্য করে নেবো একটা লালগোলাপ, বললে নাইটিংগেল।

গাছটি বললে, লাল গোলাপ যদি চাও, চাঁদের আলোর মিষ্টি রেশ টেনে তুমি গান করো। তুমি যখন গান শোনাবে তখন তোমার বুকে আমার একটি কাঁটা বিঁধিয়ে নেবে।

সারারাত ধরে আমায় গান শোনাবে, আর আমার কাঁটা তোমায় ক্ষত-বিক্ষত করবে, ও রক্তাক্ত করবে। তোমার রক্তের গতি আমার শিরায় প্রবাহিত হবে। আমাকে সজীব করে তুলবে।

—একটি লাল গোলাপের জন্য আমায় জীবন দিতে হবে? আমার কি কোন দাম নেই? নাইটিংগেল বললে চেঁচিয়ে।

জীবন সবার কাছে মূল্যবান। উপত্যকার বুকে ব্লুবেল ফুলগুলো দেখলে চোখদুটো জুড়ায়। হথর্নের গন্ধ কি মিষ্টি! উলুবনের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় ঢেউ তুলে, চেয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে। জীবনটা কত সুন্দর! পাখীর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের তুলনা হয় না।

এবার নাইটিংগেল তার বাদামী ডানা দুটি মেলে দিল বাতাসে

এবং ভেসে চললো কুঞ্জের উপর দিয়ে ছায়ার মত।

সেই তরুণটির কাছে গেল, যে এখানে আসতে বলেছিল। তোর চোখ দুটো জলে বেশ ভিজে গেছে।

—মন খারাপ করবে না, আনন্দ করো। আজ লাল গোলাপ পাবে, নাইটিংগেল বললে। চাঁদের আলোর থেকেও মিষ্টি সুরে সারারাত গান গাইবো আমি। তাতে ছোঁয়া লাগবে গোলাপ কুঁড়িতে, সে ফুটে উঠবে আনন্দে।

ছাত্রটি মুখ তুলে চাইলো নাইটিংগেল পাখির দিকে। বুঝলো না তার কথার অর্থ। পাখীর ভাষা সে বোঝে না।

ওক গাছ সব শুনলো। তার মন বেশ বিষাদগ্রস্ত হলো। সে নাইটিংগেলকে ভালবেসেছিল। তাই তারই ডালে বাসা বেঁধে সারাদিন নাইটিংগেল গান শোনাতো।

সে অশ্রুপূর্ব কণ্ঠে বললে, তোমার শেষ গান আমায় শুনিয়ে যাও নাইটিংগেল। তুমি চলে গেলে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো।

এবার নাইটিংগেল তাকে শেষ গানটি শুনিয়ে গেল।

তার গান শেষ হতে তরুণ ছাত্রটি উঠে বসলো। পকেট থেকে একটা নোটবুক ও পেন্সিল বের করে। মনের আবেগের কথা সে লিখে রাখলো।

এবার কুঞ্জবনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ছাত্রটি বললে, মেয়েটির আকৃতি আছে, কিন্তু আবেগ ও অনুভূতি আছে কি? মনে হয় তার আন্তরিকতা নেই। পরের জন্য নিজেকে বিলাতে সে যে পারবে না বুঝতে পারি।

ভাবতে ভাবতে তরুণটি নিজের ঘরে ঢুকলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার প্রেমিকার কথাই ভাবলো। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাতে যখন রূপোলী চাঁদের আলো ঝড়ে পড়লো তখন নাইটিংগেল উড়ে গেল গোলাপ গাছটার কাছে। তারপর তার কাঁটা বুকে বিঁধিয়ে সারারাত গান গেয়ে চললো। তার বুকের রক্ত ধীরে কমে আসতে থাকে।

নাইটিংগেল পাখীটি প্রথমে সেই মেয়ে ও ছেলেটির কথাই গাইলো তার সুরে গাছের ডালে ফুটে উঠলো একটি লালগোলাপ।

গানের সঙ্গে সঙ্গে পাঁপড়ি গুলো মেলতে শুরু করলো।

ফুল ফুটলো, কিন্তু বিবর্ণ।

এ গোলাপ কেমন যেন ফ্যাকাশে ও ম্রিয়মান। যেন রূপোর আয়নার বুকে গোলাপের ছায়া। তার সুরে যে গোলাপ ফুটলো তার রঙ ফ্যাকাশের লাল।

গোলাপগাছ বললে, নাইটিংগেল, তুমি আরো জোরে গান গাও বুকের কাঁটার উপর চাপ দাও। কাঁটা তোমার হৃদয়ের গভীরে ঢুকলে সেই রক্তে লাল গোলাপ ফুটবে।

এবার নাইটিংগেল কাটার উপর আরো জোরে চাপ দিল এবং সুর আরো চড়ালো। গোলাপের গায়ে পাতলা গোলাপী ছায়া পড়লো।

কাঁটা পাখীটার হৃদয়ের গভীরে ছোয়া লাগেনি। সেই রক্ত পারেনি গোলাপকে লাল করতে।

গোলাপগাছ বললে আরো জোরে ঐ বুকের কাঁটায় চাপ দাও। নইলে প্রভাতে ঝরে পড়বে ঐ গোলাপটা।

নাইটিংগেল কাঁটার উপর বেশ জোরে চাপ দিল। এবার কাটাটি তার হৃদয় বিদ্ধ করতে পেরেছে। তার যন্ত্রনা নাইটিংগেল সইতে পারছে না।

তবু সে জীবনের শেষ গান গেয়ে যাবে আজ রাতে। তার কণ্ঠস্বর তীব্র আরো তীব্র হলো।

ভোরের পূর্ব আকাশের মত গোলাপটি এবার টুকটুকে লাল হলো।

গোলাপফুলটি লাল হলো এবং নাইটিংগেল হলো ফ্যাকাশে। তার কণ্ঠস্বর ক্রমে ম্লান হয়ে এলো।

তার ছোট ডানাদুটি ঝট্পট্ করতে থাকে। চোখের সামনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার।

ক্রমে কণ্ঠস্বর তার ক্ষীণ হয়ে এলো। তার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। সে জীবনের শেষ গান গেয়ে চলে গেল।

চাঁদও শোনে, লাল গোলাপও শোনে নাইটিংগেলের শেষ গানটি।

গোলাপটি ভোরে ফুটে ওঠে লাল রঙে পাঁপড়ি মেলে।

এবার গোলাপ গাছটি আনন্দে নেচে বলে, দেখ, গোলাপটি কি সুন্দর হয়েছে।

নাইটিংগেলের কোন জবাব পেলে না, সে তখন যন্ত্রনায় নিচে ঘাসের বুকে ঢলে পড়েছে।

দুপুরে ছাত্রটি জানালা খুলে বাইরে চাইলো। দেখলে তার জানালার ধারে ফুটে রয়েছে লাল গোলাপটা।

হাত বাড়িয়ে মাথা নিচু করে সে গোলাপটি তুললো।

তারপর টুপি মাথায় দিয়ে দৌড় দিল অধ্যাপকের বাড়ির দিকে। তার মেয়েকে গিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বললে, তুমি লাল গোলাপ পেলে আমার সঙ্গে নাচবে বলেছিলে। এই নাও।

তার কথায় মেয়েটি খুশী হলো না, বরং বিরক্ত হলো।

বললে, এই ফুল আমার এই পোষাকের সঙ্গে মানবে না। কর্মচারীর ভাগনে আমার জন্যে কতকগুলো মনিমুক্তো পাঠিয়েছে। সবাই জানে ফুলের চেয়ে মনিমুক্ত বেশী দামী।

—সত্যি তোমার মত অকৃতজ্ঞ আমি আর দেখিনি!

এই বলে ফুলটাকে পাথরের উপড় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেটা নর্দমায় গিয়ে পড়লো। একটা চলমান গরুর গাড়ী সেটা থেঁৎলে দিয়ে গেল।

—অসভ্য! অকৃতজ্ঞ! তুমি একজন ছাত্র মাত্র। এর বেশী পরিচয় তোমার কি?

এই বলে অধ্যাপক কন্যা দৌড়ে চলে গেল সেখান থেকে।

ছাত্রটি এরপর বেছে নেয় নিজের যথাকর্তব্য। ভালবাসাটা নিছক একটা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা পাগলামি বা কল্পনা বলা যায় মাত্র।

এই একটা রহস্যময় বিষয়। সবকিছু অবাস্তব চিন্তা এবং স্বপ্নময় চিন্তা করে সময় নষ্ট করা।

যেন এর চেয়ে বাস্তবধর্মী দর্শনশাস্ত্র অনেকগুনে ভালো।

হাঁটতে হাঁটতে তরুণ ছাত্রটি এইসব ভাবছিল আর পথ চলছিল।

এবার ছাত্রটি নিজের ঘরে ফিরে এলো দারুণ একটা ব্যথা নিয়ে। তারসঙ্গে একটা বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে, ভালোবাসা সব মিথ্যা কল্পনার স্বপ্ন আর একটা পাগলামি!

তারপর একটা মোট বই টেনে নিল নিজের চোখের সামনে।

বইটির ধূলো ঝেড়ে পড়তে শুরু করে দিলে একনিষ্ঠ চিত্তে।

নিজের মন থেকেও তেমনি ঝেড়ে মুছে ফেলে দিল ভালোবাসাটাকে।

একনিষ্ঠ হয়ে বই পড়তে থাকে ছাত্রটি। অন্যদিকে আর চাইবে না সে আজ থেকে।

চতুর খরগোস

(আফ্রিকার রূপকথা)

আফ্রিকার জঙ্গলে একদল বাঁদর বাস করতো। একবার দারুন অনাবৃষ্টি দেখা দিল ঐ বনে।

বাঁদরের দল যত ফল ছিল বনে সব খেয়ে ফেলে। আর অনাবৃষ্টিতে গাছে নতুন ফল হয়নি।

তাই দারুণ খাদ্যাভাবে কষ্ট পেতে থাকে বাঁদরেরা।

একদিন সব বাঁদর ঠিক করলো খরগোসের কাছে যাবে বুদ্ধি নিতে। তাই গেল সবাই।

সমগ্র বনে একটি বুদ্ধিমান খরগোস ছিল। তার কাছে গেলে সে সৎ পরামর্শ দেবে নিশ্চয়ই। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র সেই খরগোস।

যেখানে সে বাস করতো সেখানে তারা গেল। খরগোসটা একা থাকতো। ঘাসের উপর শুয়ে সে তখন বিশ্রাম করছিল।

বাঁদরদের সর্দার বললে, এবার বনে একটা খাবার মত ফলও নেই। কোথায় খাবার ফলও জল পাবো বলে দাও কৃপা করে। নাহলে আমরা সবাই না খেতে পেয়ে মরবো।

খরগোসটা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবলো। পরে বললে, আচ্ছা, আমার পিছু পিছু এসো তোমরা। সেখানে অনেক খাবার পাবে।

খরগোসটা এবার তাদের নিয়ে বনের শেষে যবক্ষেত্রে নিয়ে গেল। ক্ষেতের ধারে একটা মাচা তৈরী করে তিন চারটে ছেলে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিল যাতে পশুপাখীরা ফসল নষ্ট না করতে পারে।

খরগোস বাঁদরদের বলল, এখন তোমরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকো। আমি ডাকলে তোমরা আসবে। ছেলেদের আমি কৌশলে দূরে দিয়ে যাই।

তখনকার সময়ে খরগোসরা ভাল গাইতে পারতো। তখন সেই খরগোস জমির পাশে গিয়ে মিষ্টি শুরে গান শুরু করে দিলে। আর ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে গেল গান শুনে।

তাই মাচা থেকে তারা নেমে গেল সেই খরগোসের কাছে। খরগোসটাও গাইতে গাইতে দূরে সরতে লাগলো। ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে গান শুনতে শুনতে তারা পিছু পিছু বনের গভীরে গেল।

এবার বাঁদরগুলো তাই দেখে মনের আনন্দে প্রচুর যব খেলো। বাকী যব গুলো আঁটি বেঁধে তাদের বাসস্থানে নিয়ে গেল।

বাঁদরগুলো নিরাপদে যাবার পরই খরগোসটা আবার গান গেয়ে মাঠের ধারে নিয়ে এলো ছেলের দলকে। সঙ্গে করে না আনলে পথ চিনে আসতেই পারতো না তারা।

ছেলেরা এসে দেখলো, জমিতে একটি জবও নেই। চীৎকার করে তাই তারা বললে, হায়! এখন আমরা কি করবো? বাবাদের কাছে কি করে মুখ দেখাবো?

খরগোসটা ছেলেদের কাছে গিয়ে বলে দিল, দুঃখ কি? তোমাদের বাবা মাকে বুঝিয়ে বলবো। তোমরা গাঁয়ে চলে যাও, আমিও যাচ্ছি।

ছেলেগুলোকে বাড়ি পাঠিয়ে সে গেল নদীর ধারে।

সেখানে অনেক মেয়েছেলে গাঁ থেকে কলসী করে জল নিতে এসেছে। নিজেদের কাজে লাগাবে।

তাদের বললে খরগোস, তোমরা নুন চাও তো আমার পিছু পিছু চলে এসো। তখন নুনের অভাব ছিল। তাই তার কথায় তারা রাজী হয়ে গেল। হাঁটতে লাগলো তারা খরগোসের পিছু।

যে গ্রামে ফসল বাঁদরেরা খায় সেখানে নিয়ে গেল মেয়েছেলেদের।

গাঁয়ে গিয়ে ছেলেদের বাবাকে বললে, ফসলের বদলে এই সব মেয়েদের এনেছি। এদের কাজে লাগাও। অনেক লাভবান হবে।

তাই চিন্তা করলো তাদের বাবারা। খরগোস চুপ করে সেখান থেকে পালালো। গেল মেয়েদের স্বামীর কাছে। তারা খরগোসকে দেখে চিনলো। বললে, আমাদের স্ত্রীরা কোথায় গেল? তাদের কি করেছো?

—আমি তাদের কাজে লাগিয়েছি। পরিবর্তে তোমাদের অনেক দামী জিনিস দেবো।

তাই শুনে স্বামীরা গাঁয়ে ফিরলো, খরগোস চলে গেল বনের প্রান্তে। তারপর রাখালরা জব্দ হলো তার কাছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো!

ছোট্ট পুষি

(ফ্রান্স)

একটা ছিল বুড়ো মিলওয়ালা। তার তিনটে ছেলে ছিল। বুড়ো মিলওয়ালা মরে গেলে এই তিনটি ছেলে যা সামান্য কিছু ছিল তা পেলো।

বড় ছেলেটা পেলো বাবার মিল। মেজ ছেলে পেলো বাবার গাধা।

সবছেয়ে ছোট ছেলেটার ভাগে পড়লো একটা বিড়াল, আর কিছু নয়।

—এই একটা বিড়াল নিয়ে আমি যে কি করবো তা ভেবেই পাচ্ছি না, ছেলেটা আপন মনে বলে।

বিড়ালটা সেই কথা শুনেছে। তাই শুনে সে বললে, হুজুর! আমাকে একজোড়া বুট দিন। তারপর দেখুন আমি কত চতুর।

ছেলেটা তার বেড়ালের পায়ে বুট দিল। বিড়ালটা সেই জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে চীৎকার করে বলতে থাকে, আমার মালিক শীঘ্র রাজকন্যাকে বিয়ে করবে।

এবার বিড়ালটা একটা মোটা খরগোস ধরবার জন্য প্রস্তুত হলো। সে একটা ফাঁদ পাতলো। টোপ হিসাবে রাখলো একটা বড় ভালো গাজর।

একদিন একটা খরগোস ফাঁদে পড়লো।

খরগোস নিয়ে বিড়ালটা সোজা রাজার প্রাসাদে গেল। রাজা বসে ছিলেন তাঁর সিংহাসনে। মাথা নুইয়ে রাজাকে অভিবাদন করে বিড়ালটা বলে, আমার প্রভু মারকুইস আপনাকে এটা উপহার দিয়েছেন।

সুন্দর খরগোসটি দেখে রাজা খুব খুশী হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার প্রভু কে?

—কারবারের মারকুইস। বিড়াল বললে।

রাজা বললেন, তোমার প্রভুকে বলবে যে, আমি তার উপর খুশী হয়েছি।

এবার রাজাকে অভিবাদন করে বিড়ালটি এই রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

তারপর থেকে দু'তিন মাস ধরে বিড়ালটা প্রায়ই রাজার জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে যেতো। বলতো, আমার প্রভু কারবারের মারকুইস মহারাজকে এইটা উপহার পাঠিয়েছেন।

একদিন নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করতে গিয়ে বিড়ালটা তার

মালিককে বললে, আপনি নদী থেকে ভাল করে স্নান করে আসুন। আমি একটু ঘুরে আসি।

—তুমি কোথায় চললে? জিজ্ঞেস করলে তার প্রভু অর্থাৎ ছেলেটা।

—আমি চলেছি রাজার খোঁজে।

বিড়ালের কথা শুনে তরুণটি খুব বিস্মিত হলো। সে খরগোসের পরিকল্পনার কথা জানতো না। কি যে ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু বিড়ালের কথা মত সে স্নান করতে জলে নামলো নদীতে।

বিড়ালটা জানে যে, রাজা সেদিন নদীর পাশ দিয়ে পথ বেয়ে বেড়াতে যাবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা।

রাজার গাড়ি দেখামাত্র বুট পরা বেড়ালটা চীৎকার করে বললে, কে কোথায় আছো বাঁচাও! বাঁচাও। আমার প্রভু কারবারের মারকুইস নদীতে ডুবে যাচ্ছেন।

এই চীৎকার গাড়ীর দরজা খুলে রাজা বাহিরে মুখ বাড়ালেন। বিড়ালটাকে দেখে চিনতে পারলেন। এই বিড়ালটা তার জন্য ভালো ভালো খাবার উপহার দিয়েছে।

তাই রাজা তাঁর রক্ষীকে আদেশ দেন, এখনি যাও! মারকুইসকে সাহায্য করো তাঁকে জল থেকে তুলে নিয়ে এসো।

রাজার রক্ষীরা যখন ছেলেটিকে জল থেকে ডাঙায় তুলছিল, তখন চালাক বিড়ালটা রাজার গাড়ীর কাছে গিয়ে বললে রাজাকে, আমার প্রভু যখন নদীতে স্নান করছিলেন তখন এক দল ডাকাত এসে তাঁর সমস্ত পোশাক নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম, এই থাম, আমার প্রভুর জিনিসে হাত দিবি না। তারা আমার কথা গ্রাহ্য করলো না। প্রভুর টাকা পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্র সব নিয়ে গেল।

ধূর্ত বিড়ালটা তার প্রভুর পোশাকগুলো লুকিয়ে রেখেছিল একটা পাথরের নিচে।

রাজা আদেশ দিলেন, কারবারের মারকুইসের জন্য প্রাসাদ থেকে এক প্রস্থ ভালো পোশাক নিয়ে এসো।

বিড়ালের মালিক দাঁড়িয়ে থেকে এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে, এই ধূর্ত বিড়ালটাকে পেয়ে সে কতখানি ভাগ্যবান হয়েছে।

রাজার পোশাক ঘর থেকে সুন্দর পোশাক এসে গেল গেল। পোশাকটা মারকুইসের গায়ে সুন্দর মানালো। সুন্দর চেহারাটা আরো সুন্দর লাগলো।

রাজকন্যার ভারী পছন্দ হয়ে গেল এই ছেলেটাকে। ছেলেটাও লাজুক চোখে সতৃষ্ণভাবে কয়েকবার দেখলো রাজকন্যাকে। সে রাজকন্যাকে খুব পছন্দ করলো।

রাজা তরুণ মারকুইসকে গাড়ীতে উঠতে বললেন। ছেলেটি গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছুটতে লাগলো জোরে।

বিড়ালের পরিকল্পনা সফল হলো। বুট পরা এই বিড়ালটা মহা খুশী হয়েছে। সে গাড়ির আগে আগে ছুটে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যে সে গাড়ি থেকে অনেক এগিয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে বিড়ালটা এলো একটা বিরাট প্রান্তরে। কয়েকজন চাষী সেই প্রান্তরের আগাছাগুলো পরিষ্কার করেছিল। বিড়ালটা গম্ভীরভাবে আদেশের সুরে বললে তাদের, শোন তোমরা! রাজা আসছেন। তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, এসব জমি কার? তোমরা তখন বলবে, এসব জমি কারবারের মারকুইসের। যদি তা না বলো তবে রাজার আদেশ তোমাদের কেটে ফেলা হবে।

চাষীরা সবাই বিড়ালের কথায় রাজী হয়ে গেল। বিড়াল যা বলেছিল চাষীরা তাই করলো। রাজার গাড়ী সেখানে আসতেই রাজা সেই বিরাট মাঠ দেখে প্রশ্ন করলেন, এই মাঠ কার?

তারা বিড়ালের কথাগুলো বললো। শুনে রাজা খুশী হয়ে মারকুইসকে প্রশংসা করলেন।

ছেলেটি বললে, মহারাজ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন সব।

—ফসল কেমন হয়?

—খুব ভালো ফসল পাওয়া যায়।

বিড়ালটা ছুটে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল। সে দেখলো একদল চাষী ফসল কাটছে। বিড়ালটা তাদের বললে, একটা কথা বলি শোন। তোমাদের ভালোর জন্য কথাটা বলছি। রাজা এদিকে বেড়াতে আসছেন তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন এসব জমি কার? উত্তরে বলবে, এই জমি কারবারের মারকুইসের। যদি এই জবাব না দাও তবে রাজার আদেশ তোমাদের কেটে ফেলা হবে।

তারপর রাজার গাড়ী আসতেই রাজা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এসব জমি কার?

চাষীরা সবাই বললে, আমাদের কারবারের মারকুইসের।

জবাব শুনে রাজা অবাক হলেন।

বিড়ালটা যাকে সামনে পায় তাকেই এইসব শিখিয়ে দেয়, আর রাজা বিস্মিত হয়ে যান।

বিড়ালটা এলো বিরাট প্রাসাদ দূর্গের সামনে। এই দূর্গের মালিক ছিল একটি নরখাদক রাক্ষস। এমন ধনী এদিকে আর কেউ ছিল না। কারণ যেসব জমির পাশ দিয়ে রাজার গাড়ী এসেছিল, সে সব এই রাক্ষসের।

বিড়াল আগেই খবর পেয়েছিল যে, রাক্ষসটা যাদুকর। তারসঙ্গে দেখা করতে চাইলো। বললে, তাঁকে সম্মান জানাতে এসেছি।

রাক্ষসটা তাকে অভ্যর্থনা জানালো। বললে, কি দরকার তোমার বলো শুনি?

—শুনেছি আপনার অনেক ক্ষমতা! আপনি ইচ্ছে করলে যে কোন পশু হতে পারেন?

হ্যাঁ, পারি।

—হাতি হতে পারেন? সিংহ হতে পারেন?

—পারি। দেখবে? এই দেখ সিংহ হচ্ছি।

সেই মুহূর্তে রাক্ষসটা বিরাট সিংহ হয়ে গেল। তার কাছে এতবড়

সিংহ দেখে বিড়ালটা ভয় পেয়ে গেল। সে ছাদের কার্নিশের উপর উঠে গেল।

একটু পরেই রাক্ষসটা রূপ পাল্টে ফেললো। বিড়ালটা ভীতভাবে ফিরে এলো। রাক্ষস বললে; কিহে, পালিয়ে গেলে কেন? কি ব্যাপার।

—বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

—ভয় পেয়েছিলে, বলে রাক্ষসটা হা-হা করে হেসে উঠলো।

বিড়ালটা বললে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আচ্ছা আপনি ইঁদুর হতে পারেন?

অবশ্যই পারি। দেখ, এখনি ইঁদুর হচ্ছি।

সেইমুহূর্তে বিরাট রাক্ষসটা একটা ছোট ইঁদুর হয়ে গেল। বিড়ালটা এই সুযোগ খুঁজছিল। সে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছোট ইঁদুরটার উপর এবং তাকে খেয়ে ফেললো।

ইঁদুরটা শেষ হলো অর্থাৎ রাক্ষস শেষ। একটু পরেই রাজার গাড়ি এসে গেল সেই প্রাসাদ দূর্গের সামনে। এমন সুন্দর প্রাসাদদূর্গ দেখে রাজা ভেতরে যেতে চাইলেন।

বিড়ালটা সামনে এসে বললে, আসুন। আসুন! মহারাজ! কারবারের মারকুইসের প্রাসাদদূর্গে চলে আসুন সবাই। মারকুইসের পক্ষ থেকে আমি অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

রাজা একেবারে চমকে গেলেন ও নীরব হলেন। একটু পরে তরুণটির দিকে চেয়ে বললেন, প্রিয় মারকুইস, এই প্রাসাদ দূর্গও কি আপনার?

ছেলেটি কোন জবাব না দিয়ে হাসলো।

রাজা প্রশংসায় মুখর হলেন। বললেন, এমন প্রাসাদ দূর্গ আমি দেখিনি। আপনার অনুমতি পেলে প্রাসাদের ভেতরটায় গিয়ে দেখবো।

ছেলেটা এবার ও জবাব না দিয়ে হাসলো একটু।

রাজা বিড়ালটার পিছু পিছু মারকুইসের সঙ্গে চললেন প্রাসাদ দূর্গের ভেতর। রাজকন্যার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামলো মারকুইস। তাকে সঙ্গে নিল।

এঘর, সেঘর, বারন্দা, বৈঠকখানা, শোবার ঘর অস্ত্রশালা ইত্যাদি সব ঘর দেখলেন রাজা আর রাজকন্যা। সঙ্গে মারকুইস এবং রাজার দেহরক্ষীরা চলেছেন।

রাক্ষসের অনুচরেরা আর কর্মীরা এঁদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল আর এলো না।

তাই কারবারের মারকুইসের দূর্গের মাঝে রাজা ও রাজকন্যাকে বেড়াতে কোন অসুবিধা হলো না। রাজা তরুণ মারকুইসের প্রাসাদ দূর্গ দেখে এবং সম্পদ দেখে মুগ্ধ হলেন, বললেন, তোমার কাছে অনুরোধ আমার কন্যাকে বিয়ে করো।

তরুণ সগর্বে রাজী হয়ে গেল। বিড়ালটা হাসলো। সেদিনই রাজকন্যার সঙ্গে তরুণটির বিয়ে হলো।

———

রুমপেলস্টিল টাস্কিন

(জার্মানী)

বহুদিন আগে জার্মানিতে এক মিলমালিক ছিল। তার একটা মেয়ে ছিল। রূপেগুণে সে অতুলনীয়া। লোকটি তার মেয়েকে খুব ভালবাসতো।

সর্বত্র তার মেয়ের প্রশংসা করে বলতো, এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের করতে পারবে না। লাখের ভেতর একটি মেলে। জানো ওর কত গুণ ?

ইচ্ছে করলে ও শুকনো খড় থেকে সোনার সুতো তৈরী করতে পারেব।

সত্যি, তার পোশাকের জরীর কাজ করা যা কিছু সব খড় থেকে সোনার সুতো দিয়ে তৈরী করেছে।

লোকটি হাটে-বাজারে সর্বত্র এইসব প্রশংসা করে বেড়াতো। সেসব প্রশংসার কথা লোকমুখে ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজার কানে গেল।

রাজা তখন সেই মিল মালিকের মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। মেয়েটি খবর পেয়ে ভয় পেলো এবং জড়োসড়ো হয়ে রাজদরবারে গেল। গাঁয়ের মেয়ে ভয়তো হবেই।

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নাকি শুকনো খড় থেকে সোনার সুতো তৈরী করতে পার ?

—না, মহারাজ, একথা সত্য নয়।

—তোমার বাবা যে এই কথাটা সর্বত্র বলে বেড়ায়।

—তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন, তাই সর্বদা তিনি খুব প্রশংসা করেন অর্থাৎ বড়িয়ে বলেন।

—যা রটে তার কিছু বটে। অর্থাৎ এর পেছনে কিছু সত্য আছে।

—না, মহারাজ, কথা সত্য নয়, মেয়েটি বললে রাজাকে।

এবারে রাজা রেগে গেলেন। বললেন, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। এক আঁটি খড় দিচ্ছি আজ রাতেই তা দিয়ে সোনার সুতো কেটে রাখবে। যদি তা না পারো তবে কালকেই তোমার আর তোমার বাবার মাথা কাটা যাবে।

সিপাইরা রাজার আদেশে তাকে প্রাসাদের একটি ঘরে এনে রাখলে। তারপর তাকে দিল এক আঁটি খড়। আর তার সঙ্গে একটা চরকা। তারপর তারা বাইরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

অসহায় মেয়েটি কি করবে ? ভাবনা চিন্তায় ঘরের কোণে বসে সে কেবল কাঁদতে লাগলো।

সারাদিন শুধু কাঁদলো। সন্ধ্যায় সে কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়লো। অর্দ্ধেক রাতে তার ঘুম ভাঙ্গলো। রাজবাড়ির সব ঘরের আলো নিভে গেছে। বাইরের সব প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার ঘরের সামনে লাম্বা বারান্দাটা বেশ অন্ধকার। তার শেষপ্রান্তে একটা আলো দেখা গেল। সেটা যেন ক্রমে এগিয়ে আসছে।

রাজার লোকজন কি মেয়েটার কাজ দেখতে আসছে এদিকে। কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে মেয়েটা গেল তার ঘরের জানালার কাছে।

এবার আলোটা জানালার কাছে এলো। না, না, এরা রাজার সেপাই সান্ত্রী নয়। একটা বামন। বামনের হাতে একটা আলো ঝুলছে।

অদ্ভূত দেখতে বমনটাকে। লম্বায় মোটে সে এক হাত। মাথায় টাক, মুখে বড় লম্বা দাড়ি। এত লম্বা যে সে দাড়ি বারান্দার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে।

বামনটা বন্ধ ঘরের দরজা খুলে ঢুকে মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে, কিগো মেয়েটা, কাঁদছো কেন?

—রাজামশায় আমাকে শুকনো খড় থেকে সোনার সুতো কাটতে বলেছেন। সোনার সুতো না হলে আমার আর বাবার মাথা কাটা যাবে। শুকনো খড় থেকে কি সোনার সুতো বানানো যায়?

—তাই কাঁদছো তুমি? বামন হেসে বললে, এর জন্য এত কান্নার কি আছে? আমি সোনার সুতো তৈরী করে তোমাকে দেবো।

—সত্যি বলছো? তুমি পারবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পারবো। বলো, তুমি এজন্য আমাকে কি উপহার দেবে?

পুরস্কার দেবো। আমার গলার এই হারগোছা দেবো।

—বেশ, তাই হবে। এবার তুমি ঘুমাও। আমি এখনি কাজ শুরু করে দিচ্ছি।

তখনই বামন খড়ের আঁটি কাছে নিয়ে কাজ সুরু করে দিলে। তাই দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। সত্যি সে সোনার সুতো তৈরী করেছে।

বামনের কথামত নিশ্চিন্তে মেয়েটা নিদ্রা গেল ঘরের মেঝেতে।

শেষরাতে তাকে জাগিয়ে তুললো বামন। তার সোনার সুতো কাটা শেষ হয়েছে। কত বড় একটা সোনার বাণ্ডিল করেছে সুতো দিয়ে।

—কিগো মেয়েটা, এবার আমায় বকশিশ দাও।

মেয়েটা নিজের গলা থেকে হারটা খুলে বামনকে উপহার দিল।

বামন মহাখুশি হয়ে চলে গেল।

প্রভাতে রাজা লোক পাঠালেন মেয়েটার ঘরে। এক বাণ্ডিল সুতো নিয়ে গিয়ে তারা রাজাকে দেখালেন। রাজা খুব খুশি হলেন।

এবার মেয়েটিকে এক ঘর ভর্তি খড় দিয়ে বললে, আজ এগুলো দিয়ে সোনার সুতো তৈরী করো।

খুব দুশ্চিন্তায় পড়লো মেয়েটি। কাল রাতে বামন এসে দয়া করে অসম্ভবকে সম্ভব করে দিল। আজকে তা দেবে ? সে কি রোজ আসবে ?

বন্ধ ঘরে বসে বসে ভাবতে থাকে। সারাদিন কেটে গেল। কাটলো সন্ধ্যা। অর্দ্ধেক রাত শেষ হলো। খুব অস্থির হয়ে পড়লো মেয়েটা।

সহসা খুট করে দরজায় একটা শব্দ হলো। বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেল। আলো নিয়ে ঘরে এলো সেই অদ্ভূত দর্শন বামনটা।

—কিগো মেয়ে, আজ আবার কি হলো ?

বামনকে দেখে মেয়েটির মন আনন্দে নেচে উঠলো। বললে, আজ আবার একগাদা খড় দিয়ে সোনার সুতো কাটতে বলেছে।

—এটা এমন কি আর শক্ত কাজ ? তুমি ঘুমাও, অমি কেটে দিচ্ছি। আমাকে তুমি কি উপহার দেবে ?

—আমার হাতের সোনার আংটিটা দেবো। তাহালে তুমি খুশী হবে নিশ্চই ?

—ভাল কথা, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আমি কাজ আরম্ভ করে দিই।

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর ভোর হবার অনেক আগেই বামনটা জাগালো মেয়েটাকে। হেসে বললে, এই দেখ তোমার একগাদা সোনার সুতো। দাও আমাকে বকশিশ।

মেয়েটা আঙ্গুল থেকে আংটি বের করে দিল বামনকে। বললে, বামন এবার তাহলে চলি।

বামনটা চলে গেল তার আংটি নিয়ে। সকাল বেলা রাজা লোক মারফৎ একগাদা সোনার সুতো পেয়ে খুব খুশি হলেন। মেয়েটার ক্ষমতা আছে।

রাজা মহাশয় এবার মেয়েটাকে বড় একখানা ঘরে খড় ভর্তি করে দিয়ে বললেন, আজ রাতে এগুলো থেকে সোনার সুতো তৈরী করে দাও।

মেয়েটা সাহস পেলো রাজাকে খুশী হতে দেখে। বললে, মহারাজ, আমাকে কি রোজ খড় থেকে সোনার সুতো বানাতে হবে ?

—না-না, আজ তিনদিন। আজ হলে আর তোমাকে এ কাজ করতে হবে না।

—অনেক সুতো আমি তৈরী করে দিলাম। এর জন্য আমাকে কোন পুরস্কার দেবেন না মহারাজ ?

—অবশ্যই পাবে। আজ সোনার সুতো তৈরী করো, কালই পুরস্কার পাবে। এমন পুরস্কার পাবে যা তুমি কল্পনাই করতে পারো না।

রাজামহাশয় অন্য কাজে ব্যস্ত হলেন। মেয়েটি বসে রইলো বামনের অপেক্ষায়। আজ রাতে সে এখানে আসবে তো ?

হ্যাঁ, এসেছিল বামন। মাঝরাতে বামন এসেছিল হাতে আলো নিয়ে। বলেছিল, কি খবর, আজ কি এই একগাদা খড় থেকে সোনা বানাতে হবে ? সোনার সুতো ? এতগুলো ?

—আচ্ছা, তৈরী করছি। আমাকে তাহলে কি দেবে বলো ? তবে কাজে হাত দেবো।

মেয়েটা চিন্তিত হলো। তার যে আর দেবার মত কিছু নেই। দুটো জিনিষ ছিল, দিয়েছে। আর কিছু নেই।

তার অবস্থা দেখে বামন বললে, আর দেবার কিছু নেই তোমার ? আচ্ছা, আচ্ছা। শীঘ্র তোমার বিয়ে হবে। বিয়ের পর প্রথম যে ছেলে হবে, সেটা তোমাকে আমায় দিতে হবে। বলো, রাজী আছো ?

মেয়েটা রাজী হয়ে গেল। হ্যাঁ, দেবো।

— বেশ' তবে তুমি ঘুমাও।

ভোর হবার আগেই বামন মেয়েটাকে জাগিয়ে দিয়ে চলে গেল হাসিমুখে।

রাজা লোক দিয়ে ঘর ভর্তি সোনার সুতো পেয়ে খুব খুশী হলেন। মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, সত্যি তুমি গুণী মেয়ে। যেমন তোমার রূপ, তেমনি গুন। আমি এখনও বিয়ে করিনি। তাই তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি এই রাজ্যের রাণী হলে। আপত্তি আছে তোমার দিক থেকে ?

মেয়েটা একথা শুনে লজ্জা পেলো। মুখে শুধু একটু হাসি ফুটে উঠলো।

এরপর শুভদিনে রাজার সঙ্গে মহা ধুমধাম করে বিয়ে হলো। মিল মালিক তা দেখে খুশি হলো। তার মেয়ে রাজরাণী! তার আনন্দ দেখে কে।

দিন, মাস, বছর পার হলো। এরপর রাণীর একটি ছেলে হলো।

রাজ্যে আনন্দের বান ডাকল। এই উপলক্ষে রাজামশায় একটা বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করলেন। রাজ্যের ধণী গরীব সবাই নিমন্ত্রিত। সবাই আনন্দে আসছে উৎসবে যোগ দিতে।

চারিদিকে নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া চলে। আসল ভোজ হলো তার পরে। সে এক বিরাট কাণ্ড। খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেল। শেষে অতিথিদের খাইয়ে বিদায় দিয়ে রাজা রাণী বিশ্রাম করতে চলে গেলেন নিজেদের পালঙ্কে।

শোবার ঘরেই ছেলে রয়েছে। তাকে অনেকক্ষণ দেখেননি রাজারাণী। রাণী কথাটা ভেবেই ছুটে গেলেন।

কিন্তু, ওটা কে আসছে বারন্দা বেয়ে? সেই বামন না? বামনের কথা রাণী ভুলে গিয়েছিল যে একেবারে!

রাণীর সামনে এসে দাঁড়ালো বামন হাসিমুখে। বললে, আমাকে তো নেমন্তন্ন করলে না?

—তোমার ঠিকানা জানা ছিল না, তাই বলতে পারিনি।

—আচ্ছা, বেশ। প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে?

রাণীর বুকটা কেঁপে উঠল। বললে, হ্যাঁ, মনে আছে বামনদাদা।

—দাও তবে, কথা রাখো সন্তানটা দিয়ে।

—তুমি বলো, মা কি সন্তান ছাড়া থাকতে পারে? তাছাড়া ওকে মা যে যত্ন করবে, অন্য কেউ তা পারবে না। তাই ও মারা যাবে মা ছাড়া।

বামন বললে, বেশ, তবে যখন এই শিশুর পাঁচ বছর বয়স হবে, তখন আমি আসবো। তখন আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

—তাই হবে।

বামন চলে গেল নিজের পথে।

রাণী এরপর চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে আবার বামনকে ফাঁকি দেওয়া যাবে? ভাবতে ভাবতে ভুলে গেলেন এই প্রতিজ্ঞার কথা।

এরপর রাজপুত্রের পাঁচ বছর পূর্ণ হলো। সেদিন ঠিক অর্দ্ধেক রাতে দরজায় ঠক্-ঠক্ শব্দ হলো। পাশের ঘরে রাজা ঘুমাচ্ছেন।

রাণী উঠে দরজা খুললেন। বামনকে দেখে চমকে গেলেন এই অর্দ্ধেক রাতে।

একটুখানি হেসে বামন বললে, কেমন আছো? আজ পাঁচ বছর পূর্ণ হলো। ছেলেটাকে দাও।

—এ তুমি কি বলছো দাদা ! বলো, কোন মা কি তার ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারে ?

—আমাকে যখন দেবে বলেছিলে তখন মনে ছিল না ?

—ভুল করেছিলাম দাদা । ছেলেটার বদলে তুমি অর্থ উপহার নাও । জমিদারী চাও, তাই দেবো ।

—ওসব নিয়ে আমি কি করবো ? যা দিতে চেয়েছিলে তাই দাও ।

—ক্ষমা করো বামনদাদা ।

—না, কথা রাখতেই হবে তোমাকে । ছেলে আমার চাই । রেগেই বললে বামন ।

রাণী কাঁদতে লাগলো ছেলেকে জরিয়ে ধরে । —ছেলেকে দেবো না ।

বেশ, কেঁদো না । তিন সত্যি করে বলো আমার নাম কি । যদি বলতে পারো, তোমার ছেলেকে মুক্তি দেবো । কথা দাও । কাল অর্দ্ধেক রাতে আসবো । যদি না বলতে পারো ছেলে নিয়ে যাবো ।

কথা দিল রাণী । বামন চলে গেল ।

পরদিন অর্দ্ধেক রাতে বামন আবার এলো । বললে, রাণী, বলো আমার নাম কি ?

—বলছি, তোমার নাম চার্লস, ফ্রেড, অটো ।

—অসম্ভব হলো বলা ।

—তবে তোমার নাম ফ্রানজ, ফ্রিৎস, হাইন ——

—না - না, হলো না । আমার নাম বলা অত সোজা নয় । পারলে না ।

রানী আবার কেঁদে ফেললো । বললে, বামনদাদা তুমি কত উপকার করেছো দুর্দ্দিনে । আমাকে আর একটা দিন সময় দাও । কথা রাখো ।

—বেশ, আজ যাচ্ছি । কাল রাতে আসবো । না বলতে পারলে ছেলেকে নিয়ে যাবো ।

বামন চলে গেল মস্তবড় লম্বা দাড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে। সে জানে রাণী বলতে পারবে না ।

ভোর হতে রাণী চারিদিকে খবর দিলেন, যে বামনের নাম বলে দিতে পারবে তাকে অনেক অর্থ পুরস্কার দেবেন ।

রাণীর লোকেরা বামনের নাম বলতে পারলো না । তারা ফিরে এলো চারিদিক থেকে । রাণী চিন্তায় ভাবনায় পাগল হলেন ।

মাঝরাতে বামন এলো দরজায় আঘাত করে। বললে, রাণী আমার নাম কি ?

— টমাস, হেনরী, উইলিয়াম —

—না - না, হলো না। কেন, মিছিমিছি অত চেষ্টা করছো। পারবে না। ছেলেটাকে দিয়ে দাও।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো রাণী। কাঁদতে কাঁদতে বললে, আর একটা দিন সময় চাই বামনদাদা। তারপর যা আছে কপালে হবে।

—বেশ, আর একবার সময় দিচ্ছি। কাল যদি নাম বলতে না পার, তবে তোমার ছেলেকে নিয়ে যাবো আমি।

চলে গেল বামন দাড়ি দুলিয়ে হাতের আলো নিয়ে।

রাণী ভোর হবার জন্য অপেক্ষা করলো না। চারিদিকে লোক পাঠাল বামনের নাম জানবার জন্য। যে নাম এনে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

পর দিন সন্ধ্যায় একজন লোক ছুটে এলো রাজবাড়ীতে। রাণীমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তখনি তাকে রাণীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সে বললে, ঐ অনেক দূরে একটা বন আছে। তার মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। রাত্রে ঘুরতে গিয়ে দেখি মাটির নিচে থেকে এক দাড়িওয়ালা লোক উঠে এলো। তাকে দেখে গাছের মাথায় উঠে গেলাম। বামন মাটিতে ফুঁ দিতে আগুন জ্বলে উঠলো। বামন তাতে রান্না চাপিয়ে দিয়ে আগুনের চারপাশে নাচতে লাগলো আর গাইতে লাগলো গান।

গান গাইতে গাইতে নিজের নাম বলে ফেলেছে। তার নাম রুম — পেলস্টিল টাস্কিন।

একথা শুনে রাণীর আনন্দ আর ধরে না। সে পালঙ্কে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। মুখে তার হাসি আর ধরে না।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাণী নাচতে লাগলো। কি তার আনন্দ কি হাসি !

পুরস্কার নিয়ে লোকটা চলে গেল প্রাসাদ ছেড়ে নিজের বাড়ীর দিকে। এরপর মাঝরাত নেমে এলো। বামন এলো দরজায় টোকা দিয়ে। তাকে খুব খুশী দেখাচ্ছে। আজ ছেলেকে নিয়ে যাবেই।

—এইযে বামনদাদা, এসো, বসো। রানী খুব আদর করে বসালো তাকে।

—না - না, সময় কোথায় আমার বসার বা বেশী কথা বলার। আমার নাম বলতে না পারলে আজ তোমার ছেলেকে নিয়ে যাবো।

—বসো, বলছি তোমার নাম। অনেক কিছু চিন্তার ভান করলো রাণী।

—বলো, দেরী করো না। বামন রেগে বললে রাণীকে।

—তোমার নাম ক্লোভিস ?

—না - না, হলো না।

—লিটয়ার পাইক ?

—না - না।

—তবে কি হাসড্রুবল ?

—হয়নি। এবার কি আমাকে ছেলেটাকে দেবে ?

—তবে মনটানাস ?

—না - না, রাণী, হলো না। ছেলেকে দাও এবার।

—আঃ, রাগ করছো কেন ?

—আর একবার মাত্র সময় দিলাম তোমাকে। আর বলতে দেবো না তোমায়।

—তবে তোমার নাম রুমপেলাস্টিল টাস্কিন।

বামন অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষন তার মুখে কোন কথা সরলো না। তারপর রেগে গেল।

চীৎকার করে বললে, তুমি ডাইনী। কি করে তুমি জানলে আমার নামটা ? কেউ আমার নাম জানে না মনে রেখো। তবে ?

রেগে আগুন হলো বামন।

রাগের প্রচণ্ড দাপটে সে ফুলতে থাকে। কি করবে ভেবে পায় না। সহসা সে ঘরের মেঝেতে মারলো এক লাথি। তার এক পা ঢুকে গেল মেঝের ভেতরে।

তারপর সে এক পায়ে মারলো আর এক লাথি। সেই লাথিটাও এত জোরে দিল যে, সে পাও ঢুকে গেল নিচে।

তারপর বামনের সর্বাঙ্গ ঢুকে গেল সেই গভীর গর্তের ভেতরে।

তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল মেঝের গভীর গর্তের ভেতর।

রানী তা দেখে খুব খুশী হলো। তার রাজপুত্রকে এবার বুকে জড়িয়ে ধরলো অবেগে। আমার খোকাকে আর চাইবে না বামনটা!

মায়াবী পাইথন

(দক্ষিণ আফ্রিকার রূপকথা)

কোন একদিন এক গ্রাম্য সর্দারের ভীষণ অসুখ করেছিল। দিনরাত সে নিজের কুড়েঘরের ভেতর শুয়ে থাকতো। সর্দারটি গ্রামের লোকদের কাছে ছিল খুব প্রিয়।

তাই গ্রামের সব লোক তার রোগ সারাবার জন্য চেষ্টা করে। বহু রকমে চেষ্টা চলে।

তাই জঙ্গল থেকে নানা গাছ-গাছড়া এনে তা মধু দিয়ে সিদ্ধ করে সর্দারকে খাওয়ায়। কেউ গলায় মাদুলী বেঁধে দেয়।

তার ঘরের দরজায় মন্ত্র পড়ে নানা গুঁড়ো ছড়ায়। অনেকে যাদুকরী গান গায়। রোগ তাড়াবার জন্য ঢাক-ঢোল বাজায়। যে যা জানে সে তাই প্রয়োগ করে।

এতকিছু করেও সর্দারের রোগ বেড়ে যায়। গ্রামবাসীরা বলতে থাকে, এবার সর্দার নিশ্চয় মরে যাবে।

একদিন এক অপরিচিত ব্যক্তি গাঁয়ে এসে বললে, সর্দারের অসুখ করেছে, তোমরা কেন সেই মায়াবী পাইথন সাপটা আনিয়ে নিচ্ছ না?

— কেন?

— অনেক মারাত্মক রোগ সারাতে পারে ঐ সাপ।

তখন গ্রামবাসীরা সেই লোকটাকে সাপটার সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে বললে। সে তখন দূরে হাত বাড়িয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। বললে, ঐ পাহাড়ের গায়ে এক গুহা আছে। ঐ গুহায় মায়াবী সাপটা থাকে।

গ্রামবাসীরা বললে, যদি ঐ সাপটাকে বলি তবে কি রোগ সারাতে আসবে?

লোকটা বললে, হ্যাঁ, ঠিক আসবে। তোমাদের ভেতর সবচেয়ে সাহসী লোককে পাঠাবে। অনেক দূরের পথ এবং সাপটাকে দেখতেও ভয়ঙ্কর।

পরদিন প্রত্যুষে সর্দারের ছেলে সেই দূরের পাহাড়ের দিকে রওনা দিল। কারণ সর্দারের ছেলে নিজেকে গাঁয়ের ভেতর সবচেয়ে সাহসী এবং বীর বলে মনে করতো।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক পথ হেঁটে শেষে সে পাহাড়ের নিচে গুহার সামনে দাঁড়ালো।

গুহার সামনে ফাঁকা জায়গায় দাড়িয়ে সর্দারের ছেলেটা ডাকতে থাকে, মায়াবী পাইথন। তুমি আমাদের বিপদে সাহায্য করবে? আমাদের সর্দার

যে মরতে বসেছে ! মুমূর্ষু যে তোমার সাহায্য চায় ।

এবার তালগাছের মত মোটা পাইথন সাপটা বের হয়ে এলো গুহা থেকে । বললে, অবশ্যই সাহায্য করবো তোমাদের সর্দারকে। আমি তোমার দেহ জড়িয়ে ধরবো আর তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের গাঁয়ে ।

পাইথনটা এবার সর্দারের ছেলের কোমরটাকে জড়িয়ে ধরলো । সেএত ভারী সাপটাকে সহ্য করতে পারছিল না। তাই ফেলে দিল সাপটাকে। বললে, না, না, আমি তোমাকে বয়ে নিতে পারবো না । আমার পিছু পিছু তুমি চলো ।

রেগে গেল পাইথন। আর বললে, কাপুরুষদের জন্য আমি কিছু করবো না। তোমার পরণে যে কাপড় ও গহনা আছে তা আমাকে দাও ।

এই বলে পাইথন তার মুখ হাঁ করতে সর্দারের গা থেকে কাপড়-ছোপড় ও গহনাগুলো আপনা থেকে ঢুকে গেল তার মুখে ।

পাইথন বললে, যাও, এসব আমার ।

সর্দারের ছেলে হতাশ হয়ে ফিরে এলো গ্রামে। এসে বললে, সেখানে যা যা ঘটেছিল ।

এবার একজন শিকারী এগিয়ে এসে বললে, আমি যাবো। সে নিজেকে খুব সাহসী মনে করতো। সে বললে, একটা সাপকে আমি ভয় করি না ।

তাই বলে সে পাহাড়ের দিকে গেল। তারপর গুহাটার সামনে গিয়ে বললে, পাইথন, এসো তুমি তোমার যাদু দিয়ে আমাদের সর্দারের রোগটা ভাল করে সারিয়ে দাও ।

পাইথনটা তার ডাকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই শিকারী ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। পাইথন বললে, আমি যাবো। আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে ।

এই বলে পাইথনটা শিকারীর কোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। শিকারী ভয়ে চীৎকার করে পিছিয়ে গেল। বললে, আমি বয়ে নিতে পারবো না। তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি ।

অজগর বললে, তুমি কাপুরুষ! এই সব কাপুরুষদের জন্য কিছু করি না ।

তারপর সে হাঁ করতেই শিকারীর গায়ের পোষাক ও গহনা তার মুখে চলে গেল ।

শিকারীটা ভয়ে পালিয়ে গেল গ্রামে। গ্রামের লোকদের সব কথা একে একে বললে। তারা সবাই হায় হায় করতে থাকে ।

একজন যোদ্ধা গেল পাইথনের কাছে। সে কিন্তু উপরে সাহস দেখিয়েছে, অন্তরে সাহস দেখাতে পারে নি। শিকারীর চেয়েও সে ভীরু।

পাইথনটা দেখেই সে পালিয়ে গেছে। তারও কাপড় চোপড়, গহনা ও শিরস্থাণ নিঃশ্বাসে কেড়ে নিয়েছে।

যোদ্ধা হতাশ হয়ে ফিরে এলে হাহাকার পড়ে গেল গাঁয়ের ভেতর সবাই বলাবলি করতে থাকে, সর্দারের অসুখ আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাকে আর বাঁচানো যাবেনা।

সর্দারের একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে সবকিছু শুনে এলো। বললে, আমি সেখানে গিয়ে সাপটাকে নিয়ে আসবো।

তার কথা শুনে আগে যে তিনজন গিয়েছিল তারা নিষেধ করলো মেয়েটাকে। বললে, পাইথনটা যে কত বড় সে বিষয়ে কোন ধারণাই নেই তোমার। তোমায় মেরে ফেলবে।

মেয়েটা কোন নিষেধ শুনলো না। বাবা যে মারা যাবে না গেলে। পরদিন সকালে তাই রওনা দিল সেই পাহাড়ের দিকে।

সর্দারের মেয়ের ডাকে পাইথনটা গুহার ভেতর থেকে বের হয়ে এলো। বললে, সেইসব বীরগুলো কোথায় গেল? সামান্য একটা কিশোরীকে পাঠিয়েছে? কেন তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছ না?

—আমি তোমাকে আমাদের গাঁয়ে বয়ে নিয়ে যাবো। চলো তুমি। আমার গা জড়িয়ে ধরো। বাবার খুব অসুখ। বোধ হয় বাঁচবে না।

পাইথনটা এবার মেয়েটার গা জড়িয়ে ধরেলো। তখন মেয়েটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কোন চীৎকার করলো না, বা ফেলে দিয়ে পালালো না।

এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাঁয়ের দিকে পা চালালো পাইথনকে গায়ে জড়িয়ে।

গাঁয়ের লোকজন তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো যে যেদিকে পারলো। অনেকে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল।

মেয়েটি তার বাবার ঘরে ঢুকে দেখলো, তার বাবা মরার মত পড়ে আছে। দেহে যেন প্রাণ নেই।

পাইথন তখন সর্দারের বিছানার কাছে গিয়ে তার উপর মুখ তুলে দু'একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো।

হঠাৎ সর্দার মাদুরের উপর বসে তার চোখ দুটো রগড়াতে থাকে। বললে,

আমি কি ঘুমাচ্ছিলাম ?

মেয়েটা বললে, না, বাবা, তোমার দারুণ অসুখ করেছিল তুমি জানো না। এই সাপটা তোমাকে ভাল করলো।

সাপটা এবার বললে, তাহলে এবার আমি যাই। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরি, আর তুমি বয়ে নিয়ে যাও দেখি সেই পাহাড়ের গুহায়।

খুশী হয়ে সর্দারের মেয়ে তার বাবাকে বললে, আমি সাপটাকে পাহাড়ের গুহায় রেখে আসি, বাবা।

গ্রামবাসীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে। মেয়েটা সাপের কাছে গেল, পাইথনটা তার দেহটা জড়িয়ে ধরলো। মেয়েটা তাকে পাহাড়ের গুহায় রেখে এলো এবং তাকে ধন্যবাদ জানালো।

মেয়েটি চলে আসতেই পাইথনটা বললে, আর একটু দাঁড়াও।

এই বলে সাপটা গুহার ভেতর দিয়ে একটা বড় মাটির পাত্র গুহার ভেতর থেকে বের করে এনে মেয়েটিকে দিয়ে বললে, এগুলো সব তোমাকে দান করলাম।

মেয়েটি দেখলো, মাটির পাত্রে কতকগুলো পুরুষের পোষাক এবং গহনা রয়েছে।

পাইথন বললে, যারা আমার কাছে এসে ভয় পেয়েছিল, তাদের কাছ থেকে নিয়েছি। এখন এগুলো তোমার।

মেয়ে সাপটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল নিজের গ্রামের বাড়ীতে।

মেয়েটা গ্রামে ফিরে দেখলো ঢাক বাজছে। গ্রামটাই আনন্দে মেতে উঠেছে। সর্দার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং গ্রামে আনন্দোৎসব চলছে। গ্রামে হৈ চৈ চলছে।

মেয়েটা তা দেখে নিজেও খুব আনন্দবোধ করলো। গ্রামবাসীরা এবং তার বাবা দেখলো বড় মাটির পাত্রে অনেক পোষাক ও গহনা। সবাই বিস্মিত হলো।

যাদের ঐ পোষাক এবং গহনা তারা চিনতে পারলো সেগুলো। বললে, এগুলো আমাদের। সাপটা নিঃশ্বাসে আমাদের গা থেকে টেনে নিয়েছে পোষাকগুলো এবং এই গহনাগুলো। তাই ফিরিয়ে দাও এগুলো আমাদের হাতে।

সর্দার বললে, না-না, এসব কিছু পাবে না তোমরা। তোমাদের কাপুরুষতার ফলে এগুলো হারিয়েছো। আর সাপটা আমার মেয়ের সাহসিকতার জন্য

এগুলো তাকে খুশী হয়ে দান করেছে।

সর্দারের ছেলেও তার পোষাক ও গহনাগুলো চাইলো। সর্দার বললে, না, তুমিও পাবে না।

সবাই সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে সব ঘটনাগুলো।

মেয়েটাও সব পোষাক ও গহনা রেখে দিল, কাউকে দিল না বাবার পরামর্শ মত।

এরপর এই মেয়ের দিকে সবার নজর পড়লো, সাংঘাতিক সাহসী মেয়ে এবং ভাগ্যবতীও বটে।

একদিন তারপরে তার বিয়ের জন্য সব প্রস্তুতি চললো। মেয়েটার মূল্য বেড়ে গেল গ্রামে।

মহা আনন্দে সর্দার তার মেয়ের বিয়ে দিল। মেয়েটা বাবার পরামর্শমত পাইথনের দেওয়া পোষাক ও গহনাগুলো সহ মাটির পাত্র নিয়ে শশুরবাড়ী গেল। সেগুলো তার সন্তানদের ব্যবহারের জন্য রেখে দিল।

তিনজন মহিলা

(জার্মান কাহিনী)

বহুদিন আগের কথা একটা কুড়ে মেয়ের গল্প। কোন কাজের নামে তার গায়ে জ্বর আসতো।

তাই তার মা রেগে মেয়ের গালে এক চড় মেরেছিল। মেয়েটা তখন দারুণ কাঁদতে লাগলো।

তখন ঐ দেশের রাণী গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। কান্না শুনে গাড়ি থামিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? মেয়েকে মারলে কেন?

মা লজ্জা পেয়ে গেল। নিজের মেয়ের কর্মভীরুতার কথা কাউকে বলতে লজ্জা করে না? তাই বললে, দেখুন রাণীমা, মেয়েটা সারাটা দিনরাত চরকায় কেবল সুতো কেটেই চলেছে। বারণ করেছি, থামে না। অত রেশম এখন আমি কোথা থেকে দিই বলুন?

রাণী সে কথা শুনে খুব খুশী হলেন। তাই বললেন, বাঃ! এটা তো বেশ ভাল কথা। এই মেয়েটাকে আমায় দাও। ও আমার রাজপ্রাসাদে থাকবে থাকবে। আমি ওকে এতো রেশম দেবো যাতে সারাদিন ধরে যতখুশী সুতো কাটতে পারবে।

তা শুনে মা খুশী হলেন। তারপর তাঁর কথায় রাজী হলেন। রাণীমা মেয়েটাকে নিয়ে তাঁর প্রাসাদে চলে গেলেন।

তাকে নিয়ে এমন তিনটি ঘরে ঢুকলেন, যেসব ঘর ভর্তি কেবল রেশম আর রেশম। মেয়েটাকে বললে, তুমি বসে বসে এই রেশমগুলের সুতো করো। যদি সবগুলো তুমি বুনে ফেলতে পারো, তবে বড় রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।

—আমরা যে গরীব!

—গরীব তা কি হয়েছে। গুণই মানুষের আসল সম্পদ। কাজ করে যাও।

মেয়েটা মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। সে যে অলস, সারাদিন ধরে রেশম কাটলেও সারাদিন বুনেও এতগুলো বোনা যাবে না। এতগুলো বুনতে তিনশো বছর লেগে যাবে।

তাই সে ঘরে বসে কেবল কাঁদতে থাকে। তিনদিন চরকায় হাত দিতে পারেনি। রাণী দেখতে এলেন। তিনি অবাক হলেন এসে। সহসা দেখতে পেলেন মেয়েটা কাঁদছে। মেয়েটা বললে, মাকে ছেড়ে এসে দুঃখে কাজ করতে পারছে না।

রাণীমা তা শুনে রাগলেন না। শুধু বলে গেলেন, কাল সকাল থেকে শুরু করা চাই-ই চাই, বুঝলে ?

মেয়েটা একলা কেঁদে কেঁদে জানালার ধারে এসে দেখলো চেয়ে, এমন কেউ আছে কিনা যার কাছ থেকে কিছু সাহায্য ভিক্ষা করা সম্ভব।

সহসা সে দেখতে পেলে তিনটি মেয়েছেলেকে এবং তাদের একজনের বড় চ্যাপ্টা পা, অপর জনের নিচের ঠোঁটখানা সম্পূর্ণ ঝুলে পড়েছে। তৃতীয় মহিলাটির দুটো বুড়ো আঙ্গুল মোটা।

এই মেয়েটাকে দেখে তারা জানালার নিচে দাঁড়ালো। জিঞ্জাসা করলে, কিছু বলবে ? বলো ?

মেয়েটার বিপদের কথা শুনে মহিলারা হেসেই খুন। বললে, সাহায্য করা যাবে, এ আবার কি কাজ। তবে আজ থেকে আমায় মাসী বলে ডাকবে। আর তোমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে হবে। সেখানে তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবো। যদি রাজী থাকো, তবে এখনি রেশমগুলে বুনে দিচ্ছি।

মেয়েটি তা শুনে রাজী হয়ে গেল। বললে, এসো, ভেতরে।

তাই শুনে তিনটি মহিলাই প্রাসাদে ঢুকে পড়লো। মেয়েটা তাদের এক নম্বর ঘরে নিয়ে গেল। তারা সেখানে বসে একমনে রেশম কেটে চলে।

তিনটি মহিলাকে মেয়েটা লুকিয়ে রাখলো। রাণীমা যাতে দেখতে না পায়।

রাণীমা বার বার এসে দেখছেন রেশম খুব তাড়াতাড়ি বোনা হয়ে যাচ্ছে। তিনি খুব খুশী। এমন কাজের মেয়ে দেখাই যায় না।

প্রথম ঘরের কাজ শেষ করে তিনটি মহিলাই দ্বিতীয় ঘরে ঢুকলো। সেঘরের কাজ শেষ করে তিননম্বর ঘরে গেল। সেটা শেষ করলো। তারপর তিনজন চলে গেল।

যাবার সময় মেয়েটিকে বলে গেল, কথাটা ভুলে যেয়ো না যেন। তোমার বিয়েতে তোমার সঙ্গে বসে খাবো।

রাণীমা তিনটি ঘরের নিপুন কাজ দেখে রাজপুত্রের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। এমন মেয়েকে কি আর হাতছাড়া করা যায় ?

এমন গুনবতী বৌ পেয়ে রাজপুত্র খুশী হলো। দিনরাত তার কাজের ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসা করতে লাগলো। শেষে একদিন মেয়েটি বললে, শোন, আমার তিনটি মাসী আছে। যারা বহু উপকার করেছে আমাকে। বিয়েতে তাদের নেমন্তন্ন করতে হবে।

তা শুনে রাজকুমার ও রাণীমা হেসে বললে, করা হবে বৈকি। নেমন্তন্ন

এমন আর কি ।

বিয়ের দিনে মেয়ের তিন মাসী নতুন বর-বৌয়ের সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে এলো । মেয়েটা খুশী হলেও রাজপুত্র তাদের দেখে নাক সিঁটকাতে লাগলো । কি বিশ্রী দেখতে ।

যার পা গোদা তার কাছে এসে রাজপুত্র বললে, তোমার পা এতবড় হলো কি করে ?

—ক্রমাগত চরকা চালিয়ে ।

দ্বিতীয় মাসীর কাছে গিয়ে বললে, তোমার ঠোঁট দুটো ঝুলছে কেন ? কি হয়েছে ?

—তা জানো না । চরকা কাটার সময় ঠোঁট দিয়ে সুতো ভেজাতে হয় যে ।

রাজপুত্র এবার তিন নম্বরের কাছে গেল । বললে, তোমার বুড়ো আঙ্গুল চাপ্টা হলো কি করে ?

—তুমি জানো না ? আমি চরকা কাটার সময় আঙ্গুল দিয়ে সুতো চেপে ধরি ।

এই তিন মহিলাকে দেখে রাজপুত্র ভীষণ ভয় পেলে । আমার বৌ রেশমের সুতো কাটলে তারও এই অবস্থা হবে যে । না, আর তাকে সুতো কাটতে দেবো না ।

তাই করলো । বউকে সুতো কাটতে দিলে না । মেয়েটা চরকা কাটার হাত থেকে রেহাই পেলো ।

রাজারাণী হয়ে সারা জীবন সুখে কাটাতে লাগলো । আর তাদের কোন দুঃখ নেই ।

মেয়েটা রাণী হয়ে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পেলো ।